একতরফা

মানুষের জীবন খুবই সংকীর্ণ। কিন্তু চাওয়া-পাওয়া বিশাল। আমি জানি না তার কাছে বন্ধুত্বের দাবি চেয়েছি বলে কোনো ভুল করেছি কি না। ফলে এখন খুব মানসিক দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি।

ধরা যাক, তার নাম রুমী।

সে বাংলাদেশের চারটি টেকনিকাল ইউনিভার্সিটির যে কোনো একটি থেকে সদ্য পাস করা এক টগবগে যুবক। তার সঙ্গে আমার দেখা আমি যখন ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হয়েছি তখন। তরুণী মনে তাকে কেন এতো ভালো লেগে গেল বুঝতে পারিনি। আমার চারপাশে এতো লোক থাকতে অন্য জেলা থেকে আগত রুমীকে আস্তে আস্তে মনে ঠাই দিয়ে ফেললাম।

বান্ধবীদের সহায়তায় তার কাছে ফোন করলাম। শুধু তার কণ্ঠস্বর শোনার জন্য। তার কাছে আমার পরিচয় গোপন করলাম। কারণ তার সঙ্গে আমার আগে পরিচয় হয়নি। শুধু চোখ দেখাদেখি। বেশ কয়েকবার তাকে ফোন করলাম পরিচয় গোপন করে।

এর মধ্যে আমার ফ্যামিলি ব্যাপারটা জেনে যায়। ফলাফল, আমাকে বকাবকি। আমাকে তার নামে এটা বলা হয় যে, রুমী একটা বাজে ছেলে, লোভী ইত্যাদি। আমাকে বলে দেয়া হয় তার সঙ্গে ফোনে কথা বললে তার প্রতি নাকি আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে পড়বো। এসব হওয়ার আগে নাকি আব্বাকে বলে দেয়া হবে।

এরপর থেকে তার কাছে আর ফোন করার সাহস পাইনি।

কারণ আমার ফ্যামিলিতে বড় বোনেরা কখনো এ রকম করেননি। তাদেরকে পারিবারিকভাবে বিয়ে দেয়া হয়েছে। আর আমি যদি এ রকম কোনো কাণ্ড করে বসি তাহলে নেহায়েত অন্যায় হবে।

এর মধ্যে আমি এইচএসসি পরীক্ষা দিয়ে ফেলি। পরীক্ষার পর বছর দেরেক তার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি।

কিন্তু জীবনে প্রথম যাকে শুধু দেখে ভালোবেসেছি তাকে কি কখনো ভোলা যায়? তাই চার পাচ মাস আগে তার সঙ্গে পরিচয় গোপন রেখে আবার ফোন করলাম শুধু ফ্রেন্ডশিপের দাবি নিয়ে।

সে আমাকে নিরাশ করেনি।

এর মধ্যে তার কাছে অনেকবার ফোন করেছি। কিন্তু ইদানীং সে আমার পরিচয় চাচ্ছে। আমাকে বলছে, আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। ভালো লাগলে বিয়ে করবে। আমি জানি এটা তার মুখের কথা। কিন্তু তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ছি। এবং আমি চাই না তার কাছে যেন আমার এই দুর্বলতা প্রকাশ পায়। কারণ আমার আর তার মিলন কখনো হবে না। এবং আমার ফ্যামিলি ওটা মেনে নেবে না। আমিও জানি এই একতরফা ভালোবাসা তার কাছে কখনো প্রকাশ পাবে না। সে জন্য আমার মনে কোনো দুঃখ নেই। কারণ আমার এই একতরফা ভালোবাসার মাঝে কোনো বাধা বিপত্তি থাকবে না। থাকবে না, অপ্রাপ্তির কোনো যন্ত্রণা।

আমি আপন মনে এই একতরফা ভালোবাসার স্বর্গ সাজাবো যেখানে আমি আর রুমী থাকবো। এবং থাকবে আমাদের ভালোবাসার একমাত্র সন্তান। আমাদের এই ভালোবাসার স্বর্গে ১৪ ফেব্রুয়ারি আসবে। সেদিন আমার রুমী চোদ্দটা লাল টকটকে গোলাপ নিয়ে এসে আমাকে উইশ করবে। এবং আমার সারা অঙ্গে আদরে আদরে বলবে, ভালোবাসি-ভালোবাসি শুধু তোমাকে।

নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

প্রথম প্রেমের পরশ

– শাপলা

সেদিনের সেই ছোট্ট আমি কখন যে মায়ের স্নেহের আচল ছাড়িয়ে এতো বড় হয়েছি ভাবতেই অবাক লাগে। যে আমি মাকে ছাড়া দুদণ্ডও থাকতে পারতাম না সেই আমি আজ শিশির স্নাত গোলাপের ঝরে পড়া পাপড়ির

মতো মায়ের কাছ থেকে এক বছর যাবৎ ময়মনসিংহে থেকে লেখাপড়া করছি। মাঝে মধ্যে এতো খারাপ লাগে যে তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। যখন নানা-নানু বাসার বাইরে বেড়াতে যায় তখন সামনের বারান্দায় দাড়িয়ে নীরবে চোখের জল ফেলি। পড়াশোনার কারণে অনেক সময় আবার ভুলে যাই। কিন্তু রাত দ্বি-প্রহরে যখন শুতে যাই তখন হঠাৎ বুকটা আহত পাখির মতো মোচড় দিয়ে ওঠে।

এতোটা বড় হবার পরও কখনো মাকে ছেড়ে একদিনের জন্য আলাদা বিছানায় থাকিনি। তাই ব্যথাটা প্রচণ্ডভাবে আমার হৃদয়কে তোলপাড় করে দেয়।

এভাবেই নিঃসঙ্গ দিনগুলো কাটছিল। তিনশ পয়ষট্টি দিনের একটি বছর আমার কাছে বড়ই কষ্টের মনে হতো। এরই মধ্যে অনার্স পার্ট ওয়ানের ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হয়। কিন্তু ঢাকায় ২১ আগস্টে আওয়ামী লীগের জনসভায় গ্রেনেড হামলার কারণে পরীক্ষা পিছিয়ে যায়। তাই আমি ও আমার বান্ধবী মিলে বাড়ি যাচ্ছিলাম। আমি যে সিটে বসেছিলাম তার পাশে একটা সিট খালি ছিল।

এক ভদ্রলোক এসে বললেন, এক্সকিউজ মি। এখানে কেউ বসেছে কি?

বললাম, না।

তিনি বসলেন।

কথা হলো। জানা হলো। তবে তার সম্পর্কে তেমন কিছুই জানতে চাইনি। শুধু বলেছিলাম, আপনি কি পড়াশোনা করেন।

উত্তরে, না, আমি চাকরিজীবী। তারপর তার মোবাইল নাম্বারটা আমার হাতের বইটাতে লিখে বললেন, ফোন করবেন।

বললাম, চেষ্টা করবো।

বাড়ি থেকে আবার ফিরে এলাম ময়মনসিংহে। হঠাৎই বাসার সামনের দোকানে খাতা কিনতে গিয়ে কৌতূহলবশত ফোন করলাম।

ওপাশ থেকে ভেসে এলো সেই কণ্ঠস্বর। তিনি আমাকে এক কথাতেই চিনে ফেললেন। শুধু তাই নয়, আমার নামও বললেন তিনি।

পরিচয়ের পর্বটা ঘন থেকে ঘনতর হতে থাকলো। দুই একদিন দেখাও হলো।

তারপর প্রেমও হলো।

একদিকে পরীক্ষা এবং অন্যদিকে জীবনে প্রথম প্রেমে পড়া আমাকে প্রায় পাগল করে তুললো। সারা রাত ঘুমোতে পারি না। রাত জেগে পড়ার পর যখন শুতে যাই তখন তার মুখটা ভেসে ওঠে। চেষ্টা করি মা অথবা পড়া আওড়াতে। কিন্তু কিছুই হয় না। মাঝে মধ্যে দুই তিন রাত প্রায় না ঘুমিয়েই কাটাই।

ওকে (কাল্পনিক নাম-অক্ষর) আমার বাসার ফোন নাম্বার দিইনি। তবে আমার বান্ধবী *কথা*-র (কাল্পনিক নাম) মোবাইল নাম্বার দিয়েছি। অক্ষর ও কথার কাছে ফোন করে আমার সঙ্গে দেখা করার ডেট ফাইনাল করে। এ কারণে কথা সব সময়ই আমার সঙ্গে থাকে। কথা থাকতে চায় না। তবুও আমার ভয় করে, একা কোনো ছেলের সঙ্গে থাকতে।

শুনেছি প্রেম করলে মিথ্যা বলার অভ্যাস বেড়ে যায় এবং ভয় কমে যায়। আমারও অক্ষরের সঙ্গে দেখা করতে হলে বাসায় বলতে হয় স্যারের বাসায় যাচ্ছি অথবা বলি, বান্ধবীর ওখানে যাচ্ছি কিছু প্রবলেম সলভ করতে।

এর মধ্যে ও আমার গায়ে কখনো স্পর্শ করেনি। এমনকি এক সঙ্গে রিকশায়ও ওঠেনি। বরাবরই আমি আর কথা এক রিকশায় এবং অক্ষর অন্য এক রিকশায় যায়। এর জন্য অবশ্য ওর অভিমানের শেষ নেই।

ও বলে, আলট্রা মর্ডান যুগের মেয়ে হয়ে এতো কমপ্লেক্সে ভোগো কেনো?

আমি অবশ্য কিছু বলি না। যা বলার কথাই বলে। যদিও কথার সঙ্গে আমার পরিচয় আনন্দ মোহন কলেজে ভর্তি হবার পর তবুও এই এক বছরে ও আমার নাড়ি-নক্ষত্র অনেক কিছুই জানে, আমার চালচলনের ধরনও।

তারপর দিন যায়, বেলা বাড়ে। বহতা নদীর মতো সম্পর্কের গভীরতাও এক সময় বাড়তে থাকে।

গেল ঈদুল ফিতরের পর ওর সঙ্গে দেখা করতে যাই একাই পার্কে।

আমি আগে যাই।

পার্কে একা একটা মেয়ের দাড়িয়ে থাকা যে কতো কষ্টের তা সেদিনই প্রথম টের পেলাম। যতোই বলি মেয়ে–ছেলে সমান সমান কাগজে–কলমে, বাস্তবে নয়। শিক্ষা, চাকরি, সমাজে হয়তো আছে। কিন্তু বাইরে একা একটা মেয়ে মোটেও সমান নয়। ব্যক্তি দিয়ে গোষ্ঠির বিচার করছি না। কিছু মানুষ টিপ্পনি কাটে। প্রায় আধা ঘন্টা পরে ফিরে এসে দোকান থেকে রিং দিই।

ও বললো, তুমি কই?

বললাম, চলে এসেছি।

অক্ষর বললো, তাহলে আবার আসো।

গেলাম। কিন্তু রিকশা থেকে না নেমে বললাম, চলো।

ও রিকশায় উঠলো।

রিকশায় আগেই হুড তোলা ছিল। রিকশায় উঠে আমার অভিমান ভাঙাতে ও আমার ঠোটে প্রথম ভালোবাসার পরশ একে দিল। ওর ঠোঠের ফাকে আমার হালকা পাতলা ঠোট দুটো সেদিন লজ্জায় লাল হয়েছিল কি না জানি না। তবে ঘটনার আকস্মিকতায় আমার কি করার ছিল জানি না।

আমি অনেকক্ষণ চুপ করেছিলাম।

অক্ষর আমার দিকে তাকিয়ে বললো, কি, তুমি এমন কালো হয়ে গেলে কেন?

কোনো কথাই বলতে পারলাম না। এদিকে রিকশা চলছে।

ও বললো, আমরা কোথায় যাচ্ছি।

কৃত্রিম রাগত স্বরে বললাম, জাহান্নামে।

ও বললো, তুমি থাকলে যেতে রাজি।

তারপর আমার ডান হাত ও কোলের ওপর নিয়ে বললো, পাগল।

এদিকে রিকশা ঢুকে পড়েছে পুলিশ ফাড়িতে। তারপর রিকশা ঘুরিয়ে চলে এলাম পার্কের পূর্ব পাশে। অনেক্ষণ বসে গল্প করলাম।

চলে আসার সময় ও আরেকবার আমাকে কিস করলো। গাল পেতে বললো, আমায় একটা কিস করো।

আমি বাধ্য মেয়ের মতো ওর সদ্য শেভ করা গালে আলতো করে ঠোট ছোয়ালাম।

বাবা মায়ের স্নেহে যে আমি অন্য কাউকে ভাবতে পারতাম না, অসহ্য লাগতো সেই আমি অনেক বড় হয়ে গেছি বলে আমার মনে হতে থাকলো।

ও চাকরি করে। তাই ওর ইচ্ছে বিয়ে করে ফেলা। ও বলে প্রেম প্রেম খেলার বয়স ওর নেই। তারচেয়ে বরং বিয়ে করি, সংসার করি।

কিন্তু আমি সবার ছোট। কি করে বাবা মাকে বলবো যে, আমি বিয়ে করতে চাই। যদিও বড় বোনের বিয়ে হয়ে গেছে।

বড় ভাইয়া চাকরি করে, বাকি আমি পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত আছি। সেই আমি যে বাবা–মাকে অনার্স ভর্তি হবার সময় বলেছি, আমি এই চার বছর আর বিয়ে করবো না। ভাইকে বিয়ে দাও, আমার জন্য চিন্তা করতে হবে না।

কিন্তু ও আমার হৃদয়ে এসেছে হেমন্তের শেষে, শীতের শুরুতে, কাঠমল্লিকা আর দোপাটির ডালি হাতে, ওকে আমি কিছুতেই হারাতে পারবো না। হারালে আমি বাচতেও পারবো না।

সেই প্রথম প্রেমের পরশের কথা ভাববো। আয়নার সামনে দাড়িয়ে সেদিনের সেই লজ্জা রাঙা ঠোট দুটো দেখার আশায়।

ময়মনসিংহ থেকে

একটি শাড়ি

– জিয়াউর রহমান সেলিম

বিয়ের আগে আমি প্রেম করেছিলাম। সে প্রেম বেশ অন্য রকম। অন্য রকম মানে, আমার চিঠির ওজন কেজি তিনেকের উপরে আর তারগুলো দুই কেজির কিছু কম। বৃষ্টির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল মাত্র দুবার।

প্রথমবারে আমি আর ওর এক মামাতো ভাই রাতে ভাত খাচ্ছিলাম। সঙ্গে ছিল বৃষ্টির ছোট বোন। বৃষ্টি পেছনে ছিল। ও শুধু এটা–ওটা ইশারা করে ছোট বোনকে বলে দিচ্ছিল, সাহায্য করছিল নিরব পরিবেশনের মাধ্যমে।

সে বছর তাকে দেখিইনি। পেছন ফিরে আমিও তাকাইনি। আমার খুব রাগ হচ্ছিল। একটু সামনে এলে কি হয়! দেমাগী মেয়ে, না লজ্জারাঙা কিছুই যে বোঝার উপায় নেই। যা হয় হোক, সেই শুরু। এরপর পদ্মায় পানি গড়ায় কিছুটা।

দ্বিতীয়বারও ওদের ডাইনিংয়ে ভাত খাচ্ছিলাম। দুবার তাকাই।

তিনটি কথা বলে সে। কেমন আছো, কতোক্ষণ থাকবে, আবার কবে দেখা হবে এসব।

আমি খেতে খেতে হাসি। তখন সে একা। ভাগ্যিস সেদিন ওদের বাড়িতে লোকজন কম। বৃষ্টির হাতটা ধরতে খুব ইচ্ছে করে। ধরি না।

আমার বাবা তখন অসুস্থ। বৃষ্টি বিয়ের আগে আমাদের বাসায় বেড়াতে এসেছিল।

এর আগে মাকে আমি চিঠি দিয়েছিলাম। তোমার ছেলের হবু বৌকে ভালো করে দেখে নিও, মেয়েটির নাম হবে বৃষ্টি।

কয়েকদিন পর মামাতো এক বোনসহ বৃষ্টি আমাদের বাসায় বেড়াতে গিয়ে প্রথম দিনেই রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছিল। নাশতা–চা বানাতে মাকে সাহায্য করেছে। ট্রেতে করে বাবাকে পরিবেশন করেছে।

ওরা চলে আসার পর বাবা এবং মায়ের মধ্যে বৃষ্টিকে নিয়ে কথা হয়।

মেয়েটাকে কেমন দেখলে? বাবাকে মা বলেন।

কোন মেয়ে?

আরে, ওই যে বড় মেয়েটা যার চুল খুব লম্বা!

ভালোই তো। লম্বা চুল আমি দেখেছি নাকি?

তাহলে ভালো করে বলো, কেমন মনে হয়?

কারো মেয়েকে খারাপ বলবো কেন? এমন ভাবে বলছো যে, ঝামেলা মনে হচ্ছে।

তোমাকে আগে বলিনি। ছেলের বৌ হিসেবে মেয়েটিকে পছন্দ হয়?

বলো কি! তাহলে তো আরও কিছুক্ষণ কথা বলা যেতো।

সে জন্যই বলিনি। মাস্টারদের ওই একটা দোষ। তোমাকে আগে জানালে হয়তো ইংরেজি গ্রামার জিজ্ঞাসা করতে।

কি হলে কি বলতাম ওসব আগাম বলে মাথাটা আর গরম করে দিও না।

তাহলে ছেলেকে লিখে জানাও।

ওসব তোমার বিষয়। আমার ছেলে লিখলে আমি আমার মতামত দেবো।

এ কথাগুলো পরে মায়ের কাছে শুনেছিলাম। শুনে ভালোই লেগেছিল। মনে হয়েছিল জমি নরম আছে, কাজ হবে। আমার মধ্যে বেশ আশা জাগে। দেরি করা ঠিক হবে না এ মনে করে দুই এক জায়গায় টেলিফোন করি, চিঠিও দিই।

এরই মধ্যে হঠাৎ বৃষ্টির একটা খবর পাই। অনেকটা বাংলা ছায়াছবির *এই পত্রকে টেলিগ্রাম মনে করে আসবে*–র মতো একটি চিঠি লিখেছে।

বুঝতে পারি বিষয় সিরিয়াস। বাবাকেও কয়েকদিন আগে চিঠিতে বিস্তারিত লিখে জানিয়েছিলাম। এর আগে মায়ের সঙ্গে ফোনে আমার কথা হয়। অফিস ছুটি নিয়ে বাড়িমুখো হই। বাবার সঙ্গে কথা বলে বড় ভাই–ভাবীর সাথে দেখা করি। আরো দুই চারজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনকেও জানাতে বাদ রাখি না। রাখঢাকের কিছু নেই।

এর একদিন পর বৃষ্টিদের বাসায় আসি। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। ওর এক ভাবীর মাধ্যমে আশ্বস্ত করি ওকে। আমি এসেছি, চিন্তার খুব একটা কিছু দেখি না। ওর সঙ্গে সরাসরি কথা বলা যাচ্ছিল না।

পরদিন বিকেলে একদিকে নয় জন, অপরদিকে শুধু আমি কথা বলি। বাবার অসুস্থতার জন্য ওর দুজন অভিভাবককে অনুরোধ জানাই আমাদের বাড়িতে যেতে। বাবা বলে দিয়েছিলেন কথাটা। এসব বিষয়কেই বিয়ের ক্ষেত্রে বোধহয় *পাকা কথা* বলে।

ঘটনা খুব সহজ ছিল না। আমার সাহস, দ্বিধা–ভয় সব মিলিয়ে ক্ষণে ক্ষণে আমার ওপরে কতো কি যে, ভর করছিল কাউকে কোনোদিন বোঝানো যাবে না।

একটু পরেই আমার বাস ছাড়বে। বৃষ্টির এক ভাবীকে ডাকলাম। বৃষ্টির দুটো ছবি চেয়ে নিই। মা বলে দিয়েছিল। একটা ছবি রঙিন, আরেকটা সাদাকালো। ওর সঙ্গে দেখা হয়। দুজনে চোখের ভাষায় কথা বলি। আনন্দে ওর চোখ দুটো চিকচিক করে। আমার কেমন লাগে লিখে বলা যাবে না।

বিয়ের দিন বৃষ্টিদের বাড়ি নির্দিষ্ট সময়ের চার ঘন্টা পর এসে পৌছায় বরযাত্রী। পথে বরের গাড়িতে একটি ছোট ছেলে দুষ্টামি করে ঢিল ছুড়লে গাড়ির সামনের কাচটা অনেকখানি ফেটে যায়। এনিয়ে দেন–দরবারে বেশ সময় চলে যায়। একে শীতের দিন, তার ওপর কিছু আত্মীয়স্বজন আসতে দেরি করায়, সব মিলিয়ে বহু দেরিতে গাড়ি ছাড়ে। একজন খবর দিল খাবার গরম পাওয়া যাবে। নতুন করে হাড়িতে চাপানো হচ্ছে। এদিকে আমার পেটে ছুচো কামড় মারছে।

এক ভাগ্নেকে বৃষ্টির একটা ছবি দিয়ে বলি, যা ভেতর বাড়িতে দেখে আয়, আজকাল মেয়ে বদলে যায়, দেখে আয় পাত্রী ঠিক আছে কি না!

ও দেখে এসে বলে, না মামা, পাত্রী ঠিক আছে।

বৃষ্টিকে একটা স্লিপ লিখে পাঠাই। এখনো বোঝো, পাচ মিনিট সময় আছে, আমার বিত্ত–বৈভব নেই, সারা জীবন দুঃখ পাবে।

এসব দুষ্টুমি বর আসনে বসেই চলছিল বেশ। পাশাপাশি হাসাহাসি।

দেখতে দেখতে বৃষ্টির সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে যায়।

গভীর রাতে আমাদের বাড়িতে বিয়ের শাড়ি পাল্টিয়ে অন্য শাড়ি পরে শুয়ে পড়েছিল বৃষ্টি। গহনাগুলো একটা ছোট বাক্সে রাখে। একটা জানালা খোলা ছিল। ভোরে বৃষ্টি, আমি সবাই দেখতে পাই বিয়ের শাড়িটি নেই। চুরি হয়ে গেছে।

তাই বিয়ের ছবি দেখলে বৃষ্টি কাদে। সবারই বিয়ের শাড়ি আছে থাকে, শুধু বৃষ্টিরই বিয়ের শাড়ি নেই। একই শাড়ি আমি তাকে বহুবার কিনে দিতে চেয়েছি। কিন্তু সে নেয়নি। খুব প্রিয় একটি স্মৃতি হারিয়ে গেছে আমাদের। কারো বিয়ের শাড়ি পরা ছবি দেখলেই বৃষ্টির মনটা খারাপ হয়ে যায়। আমি বুঝতে পারি বৃষ্টি কাদছে। বৃষ্টির মধ্যে কেদে চলেছে স্মৃতি তাড়ানিয়া এক না বলা দুঃখ। আজীবন হয়তো ওই স্মৃতি তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে তাকে, সঙ্গে আমাকেও। শুধু আমিই তা জানি।

বৃষ্টির সেই শাড়ি পরা ছবিগুলো আছে। সেগুলো কখনো দেখলে বৃষ্টি নীরবে শুধু কাদে। আমার মনটা খারাপ হয়ে যায়। সে মন সহজে ভালো হয় না। মানুষের মন ভালো করা অতো সহজ কাজ নয়।

তেতুলিয়া, পঞ্চগড় থেকে

কাঙ্ক্ষিত বাসর

– কনি

রাত প্রায় সোয়া দুইটা। পুরো ঢাকা শহর ঘুমিয়ে গেছে।

শুধু ঘুম নেই আমার দুই চোখে।

অস্থির মন নিয়ে, ঘুমহীন চোখে তাকালাম আকাশ পানে। দেখি লক্ষ কোটি তারারা জ্বলছে কি সুন্দর করে। তারাদের এই সৌন্দর্য উপভোগ করতে না করতেই দুঃশ্চিন্তা এসে আবার গ্রাস করলো আমাকে।

আর মাত্র নয় দিন পর আমার বিয়ে।

কি আশ্চর্য!

নিজের মনকে বোঝাতে পারছি না।

আমার বিয়ে।

আর কি করেই বা বোঝাবো! কান্তের সঙ্গে আমার তো এক দুই দিনের সম্পর্ক নয়। আমাদের সম্পর্ক প্রায় চার বছরের। কিভাবে আমার চার বছরের সম্পর্কের ইতি টেনে নয় দিনের মধ্যে তাকে ভুলে অন্য এক অপরিচিত লোকের হাতে হাত রেখে তার সহধর্মিণী হবো!

অসম্ভব। ভাবতেই আমার বুকের ভেতর প্রচণ্ড তোলপাড় শুরু হয়।

দুই চোখে নেমে আসে অন্ধকার। চেনা পৃথিবীকে বড় অচেনা মনে হয়। আপনজনদের মনে হয় বড় অপরিচিত। বাবা-মা, বোন-ভাইয়েরা কেন আমার ভালোবাসাকে মেনে নিল না! কি অদ্ভুত ভাগ্য আমার। কান্ত বেকার বলে কেউ আমার ভালোবাসা মেনে নেয়নি। এটাকে ধরে নিয়েছে নিছক পাগলামি। এদিকে গাড়ি, বাড়িওয়ালা ব্যবসায়ী রেজাকে পেয়ে আমার মতামত না নিয়েই বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে।

ভাগ্যের এমনি পরিহাস যে, কান্তকে যখন খবর দিলাম আমার বিয়ে তখন সে শোনালো তার একটা ভালো চাকরি হয়েছে।

খবর শুনে হাসবো, না কাদবো বুঝতে পারছি না। তবে একটু চোখের নোনা জলে আমার বুক ভেসে যাচ্ছিল, যে চাকরির জন্যে আমাদের এই নির্জলা প্রেম স্বীকৃতি পেলনা, অথচ সেই চাকরিই বড় অসময়ে ধরা দিল। বড় অসময়ে কষ্টটাকে আরেকটু বাড়িয়ে দিল। ভাবতে পারছি না কি করবো? যতোই চিন্তা করি কান্তকে ভুলে যাবো ঠিক ততোই বেশি কান্তের অসহায়, দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখটি ভেসে ওঠে আমার মানসপটে তার সঙ্গে মনে পড়ে অজস্র স্মৃতি।

আয়নার সামনে গেলে নিজের দিকে তাকাতে পারি না। কারণ নিজের দিকে তাকালে তার কথাই বেশি মনে পড়ে। আমার গালে, ঠোটে, বুকে, নাকে, কানে, হাতে রয়েছে তার অসংখ্য আদর এবং স্পর্শ। কি করে এসব স্মৃতি ভুলি? কি করে তাকে ভুলি! তাকে ভোলা মানেই তো আমার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা, আমার আত্মা, সুখ, শান্তিকে কবর দেয়া। আত্মাকে কবর দিয়ে কিভাবে বাচবো? ভাবতে পারছি না।

উফ! আর ভাবতে পারছি না। মাথাটা কেমন যেন ঘুরছে, ধপাস করে ছাদে বসে গেলাম। ভোর হতে বেশি দেরি নেই। কিন্তু আমাকে ভাবতে হবে, আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তা না হলে বাকি জীবন আমাকে অন্ধকারেই কাটাতে হবে।

অনেক ভেবে-চিন্তে, অনেক ত্যাগের পর আমার ফাইনাল এবং ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত নিলাম। জানি না তার পরিণতি কি? তবুও ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিলাম। বিয়ের ঠিক চার দিন আগে এক সকালে কান্তের কয়েকজন বন্ধু নিয়ে কোর্টে গিয়ে তাকে বিয়ে করে ফেললাম। এরপর বাসায় জানিয়ে দিলাম।

বাসায় সে কি কাণ্ড! সেটা না হয় না লিখলাম।

কান্ত এবং আমি সেদিন তার এক বন্ধুর বাসায় উঠলাম। সেখানে তেমন কিছুই হলো না কিস ছাড়া।

তার পরের দিন আমরা বাসা নিলাম। বাসার সব জিনিস কিনলাম। সাজালাম আমাদের অনেক কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের বাসর। এলো দুজনের অনেক ত্যাগ স্বীকার করা সেই প্রতীক্ষিত রজনী। কান্ত সেই রাত বৃথা যেতে দেয়নি। আমার নগ্ন শরীরের বিশেষ সব স্থান আদরে ভরিয়ে দিচ্ছিল।

আমিও হিংস্র হয়ে উঠলাম। দুজনেই যখন চরম উত্তেজিত তখন শুরু হলো আদিম সুখের খেলা। তার কিছুক্ষণ পর দুটি দেহই ক্লান্ত এবং পরিতৃপ্ত।

আমাদের বিয়ে হয়েছে আজ প্রায় দেড় বছর। এখনো আমাদের পরিবার এই সম্পর্ক মেনে নেয়নি। কান্তদের পরিবার মেনে নিয়েছে। ওদের পরিবারের সবাই খুবই ভালো। আমার পরিবার এই সম্পর্ক মেনে নিক বা না নিক, তাতে কিছু যায় আসে না। তবে আমরা খুব সুখে আছি। পৃথিবীর অন্যদের তুলনায় লক্ষ কোটি গুণ ভালো আছি।

বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজনের জন্য সাময়িক মন খারাপ হলেও কান্ত আমাকে সেই কষ্ট অনুভব করতে দেয় না। সারাক্ষণ আমাকে আদরে আদরে, সুখে-শান্তিতে ভরে রাখে।

নোয়াখালী থেকে

বন্ধুর জন্যে

– নিঝুম রতন

দ্বীপ দেশ শ্রী লংকা। সবুজ প্রকৃতিতে ঘেরা। জাতিগত সহিংসতা দেশটাকে অনেকটা পিছিয়ে রেখেছে। তারপরও মানুষরা খুব ব্যস্ত জীবনের গতিময়তায়। খুব বেশি মাতামাতি নেই।

২০০২ সালে বেড়াতে আসি এই দেশে। পরবর্তীকালে পড়ার সুযোগ পেয়ে থেকে যাই।

সিংহলি ভাষাটা অনেকটা বাংলার সঙ্গে মিল। খুব সহজেই আয়ত্ব করে ফেলি। সুতরাং মনের ভাব যখন প্রকাশ করা যায় সহজে, এই পরবাসেও তখন বাংলাদেশের মতো বন্ধুর অভাব থাকলো না আমার।

জীবনে আমার প্রেম-ভালোবাসা আসেনি। আসবে কিভাবে? সাহায্যকারীরা প্রেম করতে পারে না এটা খুব সত্যি। দেশে থাকতে কতোজনকে প্রেমপত্র দেয়ার গোপন পিয়ন ছিলাম! অনেক অভিজ্ঞতা। তবে কষ্টের বোঝাটা বেশি। প্রেমের অবসান দেখে বন্ধুর চেয়ে আমি ব্যথা পেয়েছি মনে হয় বেশি।

এক রুমে আমি আর সিংহলি বন্ধু। খুব উঠতি বয়স তার। আমার চেয়ে অনেক ছোট। ক্লাস, টিউশনিতে যেতে যেতে মেয়েটার সঙ্গে ভাব, সেখান থেকে ভালোবাসা। জীবনে প্রথম ভালোবাসা। বন্ধু খুব চুপচাপ থাকে। ভাবে খুব বেশি। প্রেমিক পুরুষরা এ রকমই হয়। বাংলাদেশের আমার অনুপমদা বলেন, রতন, তুই যেভাবে কথা বলিস, সে কারণেও তোর প্রেম হবে না। প্রেম করতে কল্পনা শক্তি, ভাবুক মন থাকতে হয়।

চেষ্টাও করছিলাম নয় কি! আরে বাবা, একটা চরিত্র পেয়ে গেলে সেটা ছাড়ানো সহজ নয়।

বন্ধুটি এমন অন্ধ হলো, পাছে কেউ আছে সেটা পর্যন্ত দেখছে না। মেয়েটিও একটা অজুহাতে আসতে থাকে দেখা করতে আমাদের বাসস্থানে।

শেষ পর্যন্ত জেনে যায় মেয়েটির পরিবার। মেয়েটির ভাই কড়া শাসন জারি করে পড়াশোনা বন্ধসহ নানান কিছু। তার বন্ধুদের জোগাড় করতে থাকে সিংহলি বন্ধুটিকে পিটিয়ে দিতে।

বন্ধুটি একটু শুকনো।

একদিন এমন সময় মেয়েটির ভাই তার বন্ধুসহ এলো। তখন তার পাশে আমি ছাড়া অন্য কেউ নেই। তর্কাতর্কি হতে হতে হাতাহাতি চলে যাচ্ছিল। সিংহলিরা শান্ত, আমাদের মতো তেজোদীপ্ত না।

প্রথম থেকেই চুপ করে চেয়ে আছি। শেষ পর্যন্ত এগিয়ে বললাম খুব রাগতস্বরে যে, তার গায়ে হাত দিলে খবর হবে, কেউ এখান থেকে জ্যান্ত যেতে পারবে না। শরীর আমারটা তাদের সবার চেয়ে সুঠাম ছিল।

মেয়েটির ভাইটি বকতে বকতে চলে গেল বন্ধুদের নিয়ে।

রুমে শুয়ে ভাবছি আবার ঝুকি নিলাম বন্ধুর জন্য এই পরবাসেও। সেদিন, সেই আগের স্মৃতি মনে ভেসে উঠলো। হায়রে জীবন!

কলম্বো, শ্রী লংকা থেকে

ছড়াকার

- এম শিহাব উদ্দিন ভূএগ্র

১৯৮৬ সালের ঘটনা। ইন্টারমিডিয়েট পড়ছি ঘোড়াশাল সারকারখানা কলেজে।

সহপাঠী আক্তার (এটা প্রকৃত নাম নয়) আর আমি একত্রে এক রুমে বসবাস করতাম কলেজ সংলগ্ন সরকারি কোয়ার্টারে। আক্তারের বড় ভাই ঘোড়াশাল সার কারখানায় চাকরি করতেন। সেই সুবাদে তিনি দুই রুমের একটি কোয়ার্টার পেয়েছিলেন। এক রুমে দুটি খটখটে-নড়বড়ে চৌকি ফেলে আমি আর আক্তার থাকতাম-কাম-লেখাপড়া করতাম।

আক্তার প্রেম করতো শায়লা (এটিও প্রকৃত নাম নয়) নামের একটি মেয়ের সঙ্গে। প্রায় প্রতিদিনই তাদের মধ্যে চিঠি লেন-দেন হতো। প্রেমের ক্ষেত্রে চিঠি লেন-দেনের রীতিটি বোধহয় যুগ-যুগান্তর থেকে চলে আসছে কিংবা বলা যায়, ব্যাপারটি বাঙালির মজ্জাগত। প্রেম করেছে, অথচ ভাবে গদগদ মার্কা চিঠি দেয়া হয়নি এ রকম প্রেমিক যুগল পাওয়া বেশ দুষ্কর। সুতরাং আক্তার ও শায়লা বাদ যাবে কেন?

কিন্তু তাদের এ প্রেমের মজার ব্যাপারটি হচ্ছে, শায়লাকে দেয়া আক্তারের প্রায় সমস্ত চিঠিই আমার হাতে লেখা। কথাটা ঠিক পরিষ্কার করে বলা হলো না। অর্থাৎ চিঠির ভাষা, ভাব সমস্ত কিছুই আমার উর্বর মস্তিষ্কের সৃষ্টি। আক্তার আর আমি ছাড়া ব্যাপারটা অন্য কেউ জানতো না, এমনকি যার মাধ্যমে চিঠি লেন-দেন করা হতে ব্যাপারটা সেও জানতো না।

দিন দিন অবস্থাটা এমন হলো যে, আক্তার উপস্থিত না থাকলে অর্থাৎ ছুটিতে থাকলে শায়লার চিঠির উত্তর আমিই দিয়ে দিতাম। পাছে উত্তর দিতে দেরি হলে শায়লা অভিমান করে! এক পর্যায়ে অবস্থাটা এমন হলো যে, আক্তারের চেয়ে আমিই বেশি উম্মুখ হয়ে থাকি কখন শায়লার একটি চিঠি আসবে এবং আমি তার উত্তর লিখবো।

চিঠি পড়ার সিসটেমটাও ছিল বেশ মজার। দুজনে মিলে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে, হাটু থেকে পা ভাজ করে ছাদের দিকে ফেরানো থাকবে। বুকের নিচে থাকবে বালিশ। আমি শব্দ করে পড়তাম আর আক্তার বেশ মনোযোগ সহকারে শুনতো। একবার দুবার নয়বার বার পড়া হতো চিঠি যাতে করে প্রতিটি শব্দের, প্রতিটি কথার উত্তর দেয়া যায়। চিঠি পড়া শেষ হওয়ার পর শুরু হতো এর ভাবসম্প্রসারণ। লাইন বাই লাইন ধরে পুঙ্খানপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হতো। ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিতাম একটি চিঠি লিখতে গিয়ে।

আজ মনে মনে ভাবি, ওই সময় যদি নিজেদের লেখাপড়াটা এতো গুরুত্ব সহকারে নিতাম তাহলে জীবনের গতি-প্রকৃতি হয়তো অন্য রকম হতো।

যাক সে কথা চিঠির প্রসঙ্গে ফিরে আসি। উভয়ের চিঠিই শেষ করা হতো ছড়া দিয়ে। ঠিক ছড়া বলা যাবে না। দুই চারটি লাইন ছড়া আকারে লিখে দেয়া হতো। সে এক বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড।

তুমি দারোগা আমি পুলিশ,

আমি কাথা তুমি বালিশ–

এই সব আর কি!

দুই চার লাইনের ছড়া লিখতে গিয়ে আমার নাস্তানাবুদ অবস্থা। যতো ভেবে চিন্তেই ছড়া দাড় করাই না কেন, আক্তারের সেটা পছন্দ হয় না।

সে বলতো, আরেকটু চেষ্টা করে দেখ না, আরো সুন্দর কিছু লেখ না। এ রকম কাতুকুতু মার্কা ছড়া নয়, আরো ভাব থাকতে হবে। তোর নিজের প্রেমিকা হলে তো আরো বড়, আরো ভালো ছড়া লিখতি। এখন কিপ্টেমি করছিস কেন?

মনে মনে ভাবতাম, শত হোক ওদের বাসাতেই থাকি। তাও আবার বিনা পয়সায়। সুতরাং আবার শুরু হতো নতুন আরেকটি ছড়া লেখা।

শায়লাও কম যেতো না। আমাদের ছড়ার প্রশংসা তার চিঠিতে থাকবেই। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ছড়ার উত্তর সে ছড়াতেই দিতো।

ওইসব লেখা পড়ে আক্তারের চাইতে আমিই খুশি হতাম বেশি। ইন্টারমিডিয়েট কোর্স যদি দুইবছর না হয়ে চার বছর হতো তাহলে হয়তো এতোদিনের ছড়াকার হিসেবে আমার নাম, থুড়ি আক্তারের নাম দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়তো।

যাই হোক। ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পর আমি আর আক্তার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। আক্তার জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে ভূগোল অনার্সে ভর্তি হয় আর আমি কবি নজরুল কলেজে।

এরপর আজ পর্যন্ত আক্তারের সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। তবে আক্তার, শায়লা এবং আমার গ্রামের বাড়ি একই উপজেলা হওয়াতে তাদের পরবর্তী কর্মকাণ্ডগুলো টুকটাক আমার কানে এসেছে।

শুনেছি, তিন চার বছর চুটিয়ে প্রেম করার পর আক্তার ও শায়লার মধ্যে বিভাজনের দেয়াল তৈরি হয়। ঠিক কি কারণে এমনটি হয়েছিল তা স্পষ্ট করে বলতে পারবো না। শোনা যায়, শায়লাদের তথাকথিত উচ্চ বংশীয় ফ্যামিলি, গৃহস্থের ছেলে আক্তারের সঙ্গে বিয়ে দিতে নারাজ ছিল। তবে দুর্মুখেরা বলে অন্য কথা। শায়লা নাকি আক্তারের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে অন্য কারো হৃদয়ের রানী হয়ে যায়।

এ অবস্থা চলে বেশ কিছু দিন। এরপর কোনো এক অজ্ঞাত কারণে শায়লার দ্বিতীয় প্রেমও এক সময় ভেঙ্গে যায়। বোধ করি আক্তারের দেয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রেমপত্রগুলো তার হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত ছিল। সে শিকড় তুলতে গেলে যে ধরনের দিওয়ানা প্রেমিক দরকার, শায়লার দ্বিতীয় প্রেমিক বোধ করি সে রকম ছিল না।

ঠিক এ রকম পরিস্থিতিতে আক্তার আর শায়লার পুনর্মিলিনের ব্যাপারে স্বয়ং বিধাতা হস্তক্ষেপ করে। বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ একদিন শুনলাম আক্তার ও শায়লা পালিয়ে বিয়ে করে ফেলেছে।

যতোদূর জানতে পেরেছি, আক্তার তখন পাস করে বের হয়ে ঢাকার অদূরে একটি সরকারি কলেজে লেকচারার হিসেবে কাজ করছিল। কলেজ ছুটিতে গ্রামের বাড়ি যাওয়ার পথে তাকে শায়লাদের বাড়ির পাশ দিয়েই যেতে হয়। কেমন করে যেন তাদের আবার মিলন হয়ে যায়।

পুরো ব্যাপারটিই ঘটে অনেকটা বাংলা সিনেমার মতো।

ছবির শেষ দৃশ্যে হিরোর অনিবার্য বিজয়।

সর্বশেষ খবর অনুযায়ী আক্তার আর শায়লা এখন দুই সন্তানের গর্বিত জনক জননী।

আহাম্মদবাগ, ঢাকা থেকে

বশীকরণ

- ওয়াহেদুজ্জামান

আশরাফ ফকির খুব–ই গুণী লোক। ইনডিয়ার পাহাড়ে ঘুরে বড় তান্ত্রিকের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে এসেছেন। কটি চালান দেয়া, জিনপরী তাড়ানো, বান মারা, মনের মানুষকে কাছে এনে দেয়া, এসবই সে মন্ত্র দিয়ে করতে পারে।

স্ত্রী পলাতক হবার পর থেকে সরকারি বাধের ঢালে একটা মাটির ঘর তুলে একমাত্র মেয়েকে নিয়ে বাস করছে কিংবা হতে পারে ষোড়শী হাসিনা–ই বাবাকে বুকে করে আগলে রেখেছে।

লম্বা চুল মাথার চান্দির ওপর ঝুটি বেধে ঘরের বারান্দায় ফকিরবাবা ভাবের মধ্যে বসে থাকেন। নলখাগড়া দিয়ে বেড়া ঘেরা এক চিলতে উঠানের পাশে উন্মুক্ত উনুনে হাসিনা রান্না করে। আরেক পাশে পানি ঢেলে সযত্নে বড় করা দুটা গাজার গাছ থেকে পাতা ছিড়ে রোদে শুকিয়ে রাখে। শুকনো পাতা দুই হাতের তালুতে দলা দিয়ে গুড়ো করে বাবার কলকিতে সাজিয়ে দেয়। আশরাফ ফকির কষে দম মেরে অবসাদগ্রস্ত জীবন থেকে মুক্তি পেতে গলা ছেড়ে দেহ তত্ত্বের গান ধরে।

ফকিরের বাড়ি যাতায়াত শুরু করলাম আমি আর মহি। আমার টার্গেট জিনাত। মন্ত্র দিয়ে ওকে কাবু করবো। ফকিরবাবা টালবাহানা শুরু করেছেন।

আমরাও নাছোড়বান্দা। বাবাকে পটিয়ে কাজ উদ্ধার করতে হবে।

বাবার শিষ্য বনে গেলাম। কলকেতে গাজা পুরে তার ওপর নারিকেলের ছোবড়া চাপা দিয়ে আগুন দিই। ছোট টান মেরে রেডি করে কলকেসহ দুই হাত প্রণামের ভঙ্গিতে কপালে ঠেকিয়ে ভক্তিভরে বাবার দিকে ধরি।

জয় গুরু বলে বাবা যুৎসই একটা লম্বা টান মেরে কলকে উপুড় করে মাটিতে চেপে ধরে ভাবের মধ্যে চলে যায়। গাজা মহিকে আকর্ষণ করতে পারে না, সিগারেট আনার কথা বলে কেটে পড়ে।

একটু পরে হাসিনাকেও আশপাশে দেখা যায় না।

একদিন টের পেলাম ঘরের কোণে মহির মোটা সিগার হাতে ধরে হাসিনা দাড়িয়ে আছে।

মহি ওর পাজামার ফিতা খুলতে চেষ্টা করছে।

হাসিনা আরেক হাতে পাজামার ফিতা ধরে রেখে না, না করছে।

কান খাড়া রেখে ওদের ফিসফাস আওয়াজে যা শুনলাম তার অর্থ হচ্ছে, হাসিনা সিনেমার গল্পে শুনেছে রাজ্জাক কবরী হাত ধরাধরি করে গান গেয়ে বেড়ায়, তা একবার নিজ চোখে দেখার খুব শখ। আর মহি সেই টোপ ফেলছে। শুধু একবার। তাহলেই শহরে নিয়ে গিয়ে সিনেমা দেখিয়ে আনবে।

নবযৌবনা হাসিনার চেহারা মন্দ না। যদিও পরিমাণ মতো ক্যালরি পেটে কোনোদিনই পড়ে না তবুও পাছাটায় জোয়ার আসছে। বৃন্ত দুটি ওর সাইজ অনুপাতে অনেক আগেই ছোট হয়ে যাওয়া ত্যানা মতো পরনের কামিজটাকে ছিদ্র করে এই বুঝি বেরিয়ে পড়লো। মুখখানিতে কবির ভাষায়, মল্লিকা জুই না হাসলেও ঠোট জোড়ায় হতদরিদ্রতাকে ব্যঙ্গ করে সরল হাসির আভা ফুটে থাকে।

মহি যে ওর দিকেই ঝুকবে ভাবতে পারিনি। অবশ্য ও শালার দ্বারা সবই সম্ভব। একবার নাকি আম বাগানের মধ্যে ছাগলের ওপর একসপেরিমেন্ট চালাতে গিয়েছিল। কথাটা আমাদের কাছে অস্বীকার করলেও পাড়ার মেয়েরা ওকে দেখলে মুখে আচল চেপে হাসে।

বাড়ি ফেরার পথে গরিব মেয়েটার সর্বনাশ করতে নিষেধ করতে গেলে আমার ওপর চটে গেল।

শালা সাধু বনে গেছো। তুমি শালা যে বসে বসে গাজা খাও, আমি মানা করি!

এরপরে আর কথা থাকে না।

কয়েকদিনেই গাজায় অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। হাসিনা পাশে থেকে হাসে আর উৎসাহ দেয়। *ধূমমা ছাইড়্যান না। এককেবারে বুকের মধ্যে ঢুকাইয়া ল্যান।*

আমিও তাই করি।

বাবা দম মেরে গান ধরেন।

আমি পাটির ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে জিনাতকে নিয়ে আকাশে উড়ে বেড়াই।

আর মহি রেগুলার সিগারেট আনতে যায়।

ক্লাস নাইনে পড়ার সময়ই জিনাত ভরা যুবতী। ক্লাসে আরো দুটা মেয়ে থাকতে আমার দুই চোখ তখন বই-এর হরফ বাদ দিয়ে জিনাতের *চোলি ক্যা নিচে কেয়া হ্যায়* তা খুজে বেড়াই। ফলাফল, টেনে ওঠার সময় জিনাত আমার জায়গা দখল করে নিল।

সব স্যারদের দৃষ্টি এখন ফার্স্ট গার্লের দিকে। এ মেয়েই এবার স্কুলের নাম রওশন করবে। অংকে লেটার নিয়ে জিনাত ফার্স্ট ডিভিশন পেল।

আমি সেকেন্ড ডিভিশন। আর মহি কোনো রকম উড়ে গেল।

মাঝে কিছু দিন মুক্তিযুদ্ধের জন্য বিরতির পর আমরা আবার একই কলেজে। হাসি-ঠাট্টা, ইয়ার্কি, ফাজলামো সবই হয় কিন্তু জিনাতের মনের অতলে পৌছাতে পারি না। কৃষ্ণকায় দীর্ঘাঙ্গী এ মেয়ের সব কিছুতেই ড্যাম কেয়ার ভাব।

কলেজের ফাংশনে শিফন শাড়ির সঙ্গে ঘটি হাতা ব্লাউজ পরে, সুচন্দা স্টাইলে পিঠের ওপর লম্বা চুল ছাড়িয়ে দিয়ে হারমনিয়াম নিয়ে গান ধরে *আমার গানের মালা আমি করবো কারে দান।*

আমার বুকের মধ্যে চিনচিন করে ওঠে। আমি থাকতে অন্য কাউকে মালা পরাতে দেবো না। এই মেয়েকে আশরাফ ফকিরের মন্ত্র দিয়ে বশীকরণ করবোই করবো।

মহির টার্গেট যে কে আমাকে তা বলে না। সন্ধ্যা হলেই দুজনে চলে যাই বাবার দরবারে। অবশেষে বাবার মনে দয়া হলো। না, সিগারেট আনার উৎপাত থেকে মেয়েকে মুক্ত করতে সিট বোঝা গেল না। সুতার মতো সরু লতাপাতার শিকড়ের ওপর মন্ত্র পড়ে হাতে দিয়ে বললেন, যা মনের মাইনসেরে খাওয়ায়ে দে।

এবার জিনাতকে খাওয়ানোর পালা।

মহির চেহারা ভালো। যখন-তখন পকেট থেকে পাচ দশ টাকার নোট বের করতে পারে। ভালো ফুটবল খেলে। আমাদের বন্ধুত্ব সত্ত্বেও মনে মনে ওকে ঈর্ষা করি।

একদিন খুব খুশি খুশি ভাব নিয়ে বললো, ফকিরের গাছের সত্যিই খুব গুণ আছে রে।

আমি হা করে শুনতে থাকি।

গত সন্ধ্যায় ও নাকি বাবার মন্ত্র পড়া শিকড় জিনাতকে খাইয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফল পেয়েছে। জিনাত এমনই সেক্সি হয়ে পড়েছিল যে, তাকে জড়িয়ে ধরে কিস করেছে। ছাড়তেই চায় না এমন ভাব।

বিশ্বাস কর, শুধু তোর কথা ভেবে কিছু না করে চলে এসেছি।

বলে কি শালা! ঈর্ষায় আমার বুকটা জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে। সব কিছুতেই শালা আমার থেকে এগিয়ে থাকবে, তা হতে দেবো না। যে করেই হোক আজ জিনাতকে গাছ খাইয়ে আমার দিকে ফেরাবো।

দশ আনা দিয়ে এক প্যাকেট কফিলুদ্দীন বিস্কিট কিনে যত্ন করে কভার খুলে বিস্কিটের মধ্যে মন্ত্রপড়া শিকড় পুরে বাবলার আঠা দিয়ে কভার জোড়া লাগিয়ে সন্ধ্যা বেলায় জিনাতের পড়ার ঘরে হাজির।

জিনাতের চোখে মুখে হাসি হাসি ভাব।

পড়াশোনা নিয়ে আলাপ করতে করতে বললাম, তোর জন্য বিস্কিট এনেছি খাবি।

দে।

আমার আনন্দ আর ধরে না। তাড়াতাড়ি বিস্কিটের প্যাকেট হাতে দিলাম। কচড়মোচড় করে চিবিয়ে চিবিয়ে বিস্কিট খাচ্ছে আর আমি হারিকেনের আলোতে ওর পরিবর্তন লক্ষ্য করছি।

মহির কথাই তো ঠিক! জিনাতকে কেমন সেক্সি লাগছে। দুই চোখে ঢুলুনি ভাব। আমার দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসছে। এই তো সুযোগ। আমি ওর গা ঘেষে বসে উরুতে হাত রেখে চাপ দিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে ঠাস করে গালের ওপর একটা চড় পড়লো।

হারমাজাদা! আমাকে গাছ খাওয়াতে এসেছিস। এতোটুকু গাছ কেন, আস্ত একটা বট গাছ খেলেও তোর মতো গাজাখোরের সঙ্গে আমি প্রেম করতে যাবো না। বের হ আমার ঘর থেকে।

ভিক্ষা চাই না মা কুত্তা ঠেকা। পালিয়ে বাচলাম।

মহিও মনে মনে জিনাতকে কামনা করতো। রেস থেকে আমাকে বিদায় করার জন্য সেদিন বানিয়ে বানিয়ে গাছ তত্ত্বের গল্প বলে আমাকে প্ররোচিত করেছিল। ওদিকে আগেভাগেই সব কিছু জিনাতের কাছে ফাস করে দিয়েছিল। শালার বিশ্বাসঘাতকতায় আমার গুরুদক্ষিণার পাচ সিকে পয়সাই মাটি হলো।

মহিও জিনাতকে পায়নি। ইউনিভার্সিটিতে আরো দুই একজন পিছু ঘুরে এই কৃষ্ণকলির মন গলাতে পারেনি। ভালো রেজাল্ট করে সরকারি চাকরিতে জয়েন করলো। আজ উচু পর্যায়ের কর্মকর্তা।

মহি বড় ব্যবসায়ী। বনানীতে বড় বাড়ি কিনে বাস করছে।

আমি মধ্যপ্রাচ্যের লেবার। আমার স্ত্রীর ভাষায় হার্ট নামের বস্তুটাকে মরুভূমির বালির নিচে চাপা দিয়ে রেখে একটা মানি মেকিং মেশিন হয়ে গেছি।

আর হাসিনাকে বছর দশেক আগে একবার দেখেছিলাম স্বামী পরিত্যক্ত হয়ে রেল স্টেশনে ভিক্ষা করছে।

সউদি আরব থেকে
zaman90378@yahoo.com

নিজস্ব

– রূপন্তী

হয়তো সহজ কাছে আসা তাই কাছে আসি,
হয়তো সহজ ভালোবাসা তাই ভালোবাসি,
যখন সহজে কিছু পাই ভাবি, সহজ ছিল পাওয়া
আর যখন হারাই ভাবি, এতো সহজে চলে যাওয়া
শিখেছে মানুষ!

যৌবনের প্রারম্ভে পড়া হুমায়ূন আহমেদের কোনো একটা বইয়ের এই কয়টা লাইন আজো আমাকে ভীষণ কষ্ট দেয়। স্বপ্নের দেশ আমেরিকায় আমার বসবাস হলেও প্রিয় ম্যাগাজিন *যায়যায়দিন* পড়া হয় নিয়মিত। আর এটা সহজ হয় কারণ, ম্যাগাজিনটা কিনে দেয় আমার সহজ ভালোবাসার মানুষ। দুই কলম লিখতে বসলাম আমার সহজ ভালোবাসা নিয়ে। যে সহজ ভালোবাসা আমার মধ্যরাতের ঘুম কেড়ে নেয় তার এতো বড় দুঃসাহস!

তাকে চিনতাম বটে, জানতাম না। পত্রিকা মারফত জানলাম, সে একজন রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মী। আর আমি তার বিরোধী দলের রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী।

একদিন গাড়ি করে বাসায় পৌছে দিল। রাস্তায় অনেক কথার মাঝে নজরুল, রবীন্দ্রনাথ সবই এলো। বুঝতে বাকি রইলো না লোকটি সাহিত্য প্রেমিক। আমি একটু সাহিত্য পছন্দ করি তো, তাই কেন জানি আমার আরো ভালো লাগলো। তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম –

এমনি বরষা ছিল সেদিন
শিয়রে প্রদীপ ছিল মলিন
তব হাতে ছিল বিরহ বীন
মনে কি পড়ে প্রিয়?

গানটা শুনেছেন কি?

বললো, হ্যা, শুনেছি।

বাসায় নামিয়ে দিলে বললাম, বাসায় আসুন।

বললো, আরেক দিন।

দেশ ম্যাগাজিনটা হাতে ধরিয়ে দিল। ভেতরে পেলাম ফোন নাম্বার। কথা হলো। এভাবে আস্তে আস্তে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে যায়। তার প্রতি আমার সহজ ভালোবাসার জন্ম নেয়। ফোনে তিন চার ঘন্টা আলাপের মধ্যে কখনো হাসি, কখনো রাগ-অভিমান চলতো।

তার কিছু আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় অন্যভাবে। তার সঙ্গে অনেক জায়গায় ঘুরে বেরিয়েছি। সত্যি কথা বলতে কি, সে যখন আমার কাছে আসতো, নিজেকে মনে হতো পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী ব্যক্তিদের একজন। আমার অনুভূতিতে তার উপস্থিতি ছিল অন্য রকম।

আজ কয়েকদিন থেকে বুকের মধ্যে একটা কষ্ট অনুভব করি। অবশেষে আবিষ্কার করলাম যে, অন্য কিছুর কষ্ট নয়, এ আমার সহজ ভালোবাসারই কষ্ট। সময়ের প্রয়োজনে জীবনের তাগিদে আজ সে আমার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। ভাবতে কষ্ট হচ্ছে। কিছু বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। আমিত্ব ছাড়া মানুষ হয় না। অথচ সেই আমিত্বকে অন্যের মধ্যে বিলীন করে দেয়ার মতো বড় মনুষত্ব আর কিছুই নেই। বড় দেরি করে বুঝলাম, সময়ের মধ্যে সময়ানুগ হতে না পারলে সব প্রাপ্তিই তামাদি হয়ে যায়। প্রত্যেক মানুষই তার নিজস্বতার জন্যই সবচেয়ে বেশি দুঃখ পায়।

মানুষ বলেই নিজস্বতা হারিয়ে নিঃস্ব হবার কথা একজন আধুনিক, শিক্ষিত মানুষ ভাবতে পর্যন্ত পারে না! বড় গোলমেলে, ধাধার এই জীবন। কেবলি মনে হয়, জীবনের বাকে বাকে যে নদী হারায় স্রোত তার পক্ষে মোহনায় মিলিত হওয়ার স্বপ্ন দেখা বাতুলতা মাত্র। জীবন আমার যৌবনের নৌকায় এসে তীর হারালো।

নিউ ইয়র্ক থেকে

ভালোবাসার অস্ত্রোপচার

– ভোলানাথ পোদ্দার

শত ব্যস্ততার মাঝে এখনো ভালোবাসা নিয়ে লিখতে ইচ্ছে হয়। প্রিয়জনকে উপহার দিতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু ইচ্ছে হয় না আধুনিক ভালোবাসার গল্প শুনতে। ইচ্ছে হয় না আধুনিক ভালোবাসার উপমা টেনে নতুন কিছু লিখতে।

এখন ভালোবাসা গড়ে ওঠে টাকার অলংকরণে। গাড়ি আছে, বাড়ি আছে এমন ছেলেকে কে না ভালোবাসতে চায়! রাস্তায় বের হলে মজাদার আইসকৃম পাওয়া যায়। রেস্তোরায় গেলে চায়নিজ খাওয়া যায় আবার ছেলে বন্ধুর গাড়িতে ঘুরে বেড়ানো যায়। তাহলে তাকে ভালোবেসে জীবনের সব কিছু উজাড় করে দিতে অসুবিধা কোথায়!

আশার কথা, নাটক-সিনেমার কাহিনী রচনা হচ্ছে প্রকৃত ভালোবাসা নিয়ে। ভালোবাসার দাম দিতে ধনীর দুলালী রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে আসছে বস্তির গলিতে, থাকছে তার গরিব নায়কের সঙ্গে। বাস্তবে এমন ঘটনা কি ভাবা যায়! বরং বাস্তবে ঘটছে সব লোমহর্ষক ঘটনা।

বখাটে ছেলে পাড়ার একটি মেয়েকে বলা নেই কওয়া নেই, প্রস্তাব দিয়ে বসলো আমি তোমাকে ভালোবাসি। সুতরাং তোমাকে আমি বিয়ে করবো। মেয়েটি রাজি না হলে পিস্তল দেখিয়ে হত্যা করার হুমকি দিয়ে বসবে ছেলেটি। তাতেও যদি কাজ না হয়, মেয়েটির সুন্দর মুখ পুড়িয়ে দেবে এসিড নিক্ষেপ করে। ফলে মেয়েটি হয়ে পড়বে সমাজের পঙ্গু অসহায় এক বোঝা। যদি ছেলেটির ভালোবাসার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যেতো তাহলে ছেলেটি নির্ঘাত বলতো বিয়ে পরে হবে, আগে এসো আমরা উপভোগ করি।

ছেলেরা সব ধরনের আশ্বাস দিয়ে মেয়েদের সর্বনাশ করে কেটে পড়তে পারে অন্য কোথাও অন্য কোনো মেয়েদের কাছে। এগুলোকে ভালোবাসা বলা যায় কি?

আজকের সমাজে ভালোবাসা বলতে নোংরামি ছাড়া প্রকৃত ভালোবাসা খুজে পাওয়া ভার।

মিরপুর রোড, ঢাকা থেকে

বাতিল ব্যক্তি

– অনামিকা

শেষ রক্ষা আর হলো না।

অবশেষে একটা সন্তানের অভাবে এগারো বছরের সংসারটা ভেঙেই গেল।

আমি এখন রিজেক্টেড পারসন।

বাতিল ব্যক্তি।

এই এগারোটা বছরে যে কতোগুলো ঘন্টা, দিন-রাত, মাস-বছর সেটা শুধুই আমি জানি। এই সময়গুলো যে, কিভাবে কেটেছে আমি আর আল্লাহ জানে। প্রায় প্রতিটি দিন কেদেছি। এমন দিন খুব কম গেছে যেদিন কাদিনি। সাত ভাইবোনের সবার ছোট মেয়েটাকে বিয়ে দিয়েছে দশ ভাইবোনের সবার বড় ছেলের কাছে। ইউনিভার্সিটির সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী একটা ছেলে কি জানে না মাস্টার্স পাস একটা মেয়েকে বিয়ে করার সময় আর কিছু না হোক, অন্তত একটা আংটি দিতে হয়? একটা নাক ফুল দিয়ে সে আমাকে বিয়ে করেছে। বিয়ের পর দেখেছি তার অভাব-অনটন, মামলা-মোকদ্দমা, থানা-পুলিশ ইত্যাদি।

মনে পড়ে, এক ভাবী বলেছিলেন, বড় ছেলের বৌ হয়েছেন, জীবনের কোনো সাধ পূরণ হবে না।

সাধ দূরে থাক, নিজের ছোটখাটো প্রয়োজনগুলো ভুলতে শুরু করেছি। বিয়ের পর রয়ে গেলাম বাবার বাসায়। বুঝলাম চাকরি না করলে কখনোই সে আমাকে নিয়ে সংসার করতে পারবে না।

স্কুলে চাকরি নিয়ে ঢাকায় এলাম তার সঙ্গে সংসার করতে। দুই মাসের মাথায় তার মা মরে গেলেন। বাবা আগেই ছিলেন না। পড়ে গেলাম অথৈ সাগরে। ছোট ছোট এতোগুলো দেবর-ননদ আর একজন মাত্র উপার্জন করার লোক। তার প্রাণান্তকর অবস্থা। এক সপ্তাহ পর পর সে বাড়ি যায় তাদের দেখাশোনা করা ও খরচ দেয়ার জন্য।

এভাবে এক বছর পর সে সিদ্ধান্ত নিল, সে দুই তিন বছরের জন্য তার ভাইবোনদের কাছে চলে যাবে এবং সেখানে চাকরি করবে।

আমি রয়ে গেলাম ঢাকায় চাকরির কারণে। আর হয়ে গেলাম একা। এর মাঝে একটা বাচ্চা অ্যাবরশন হয়ে গেল। সে প্রতি সপ্তাহে আসে আর আমি ননদ নিয়ে সংসার করি।

একা ডাক্তারের কাছে যাই, ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকি এবং চোখের পানি ফেলি। সবাই স্বামী নিয়ে ডাক্তারের কাছে এসেছে আর আমি একা। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে কখনো ননদ নিয়ে, কখনো একা যাই এবং রাস্তায় রাস্তায় চোখের পানি ফেলি। আবার ওষুধ কিনতে মিটফোর্ড যাওয়া, কোমরে ইনজেকশন দিতে হাসপাতালে যাওয়া, সব একাই করতে হয়েছে।

এভাবেই চোখের পানিতে পার করে দিলাম পাচ বছর। পাচ বছরের মাথায় একই বছর আরো দুবার কনসিভ করলাম। দুবারই নষ্ট হয়ে গেল। চিকিৎসায় কিছু হলো না। হুজুর, কবিরাজ যার কাছে যা শুনেছি সেখানেই ছুটেছি। চিকিৎসার ব্যাপারে কোনো সহযোগিতা বা টাকা-পয়সা কোনোটাই তার কাছে পেলাম না।

অনেক অনুনয়-বিনয় কান্নাকাটি করে তাকে নিয়ে গেলাম ইনডিয়া। সেখানেও কারো কোনো সমস্যা ধরা পড়লো না। বুঝলাম সব সমস্যা কপালে।

দিন দিন তার কথাবার্তার ধরন পাল্টে যেতে থাকলো। প্রায়ই বলে, আরেকটা বিয়ে করবে। অমুকে আবার বিয়ে করাতে সন্তান হয়েছে ইত্যাদি।

এই এগারো বছরে নিজের কোনো সাধ-আহ্লাদ পূরণ হওয়া তো দূরের কথা বরং নিজের ছোটখাটো শখ-আহ্লাদ, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজনগুলো সব গলা টিপে মেরে ফেলেছি। কখনো আশপাশের কাউকে অথবা ভাইবোনদেরকে দেখে ইচ্ছাগুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চেয়েছে। তখন মনকে প্রবোধ দিয়েছি, এগুলো আমার জন্য নয়, যাদের সন্তান হয় না। তাদের কোনো ইচ্ছা থাকতে নেই। কারণ এই এগারো বছরে সে শুধু একটা বিয়ের অনুষ্ঠানে আমার সঙ্গে গিয়েছিল। এছাড়া কোনো অনুষ্ঠানে আমাকে নিয়ে যায়নি বা আমার সঙ্গে যায়নি। এই ব্যাপারে তার অভিমত, এসব জায়গায় গেলে একশজনে দুইশ প্রশ্ন করবে।

শেষের দিকে সে ভাইবোন, আত্মীয়স্বজনের বাসায় যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। তার মতে, তাদের পুলক (আনন্দ) আছে, সেই পুলক দেখতে যাবো? আমার মনে এতো পুলক নেই, তোমার থাকলে তুমি যাও।

নিজের মধ্যে চুপসে গেছি, হয়ে গেছি গৃহবন্দী। তাকে নিয়েও যেতে পারি না আবার ঘরে রেখেও যেতে পারি না।

চতুর্থবার যখন আমার আবার বাচ্চা নষ্ট হলো তখন সে বাইশ দিন আমার সঙ্গে কথা বন্ধ রাখলো। সেই সঙ্গে আলাদা বিছানা। আমার অপরাধ, বার বার বাচ্চা নষ্ট হয়। শরীরের কষ্ট, মনের কষ্ট নিয়ে ভাইবোনদেরকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে ছুটেছি, আলট্রাসনোগ্রাম, ডিঅ্যান্ডসি করিয়েছি। কিন্তু তার কাছ থেকে কোনো রকম সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সহানুভূতি কোনোটাই পাইনি। সারা দিন রাত কেদেছি আর আল্লাহর কাছে বলেছি, আল্লাহ, তুমি শুধু আমাকে একটা সন্তান ভিক্ষা দাও, আমার সংসারটা বাচাও। আমার জন্য নয়, তার জন্য হলেও একটা সন্তান দাও। সন্তান হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আল্লাহর দয়া হলো না।

পাচবার বাচ্চা নষ্ট হওয়া, তিনবার ডিঅ্যান্ডসি করা, এতোগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অপারেশন, এতো কিছু করেও একটা সন্তান পেলাম না। বরং তার কাছ থেকে পেলাম অবহেলা, অপমান, অবিচার। শারীরিক, মানিসিক, আর্থিক কষ্টগুলো সব আমার ওপর দিয়ে গেল। তারপরও সংসার টিকলো না।

যখন সে সবার সামনে বিয়ে করার ঘোষণা দিবে বললো তখনো সে দুই দিন আমার কাছে ছিল। এ দুই দিন আমি পাগলের মতো কেদেছি। মানুষ মরে গেলে যেভাবে কাদে সেভাবে। লাশ ধরে নয়, জীবিত মানুষ জড়িয়ে ধরে কেদেছি কিন্তু সে নির্বাক, নিশ্চল। সে তার সিদ্ধান্তে অটল। বিয়ে করার ঘোষণা দিয়ে আমার সঙ্গে সব রকম যোগাযোগ সে বন্ধ করে দিল।

এরপর বার বার তার কাছে গেছি, ফোন করেছি কিন্তু তার দিক থেকে সব বন্ধ। বরং প্রতিবার সে আমাকে অপমান করে ফিরিয়ে দিয়েছে। সন্তান ছাড়াও স্বামী-স্ত্রী সংসার করে এ রকম হাজারটা উদাহরণ দেখিয়েছি।

তার উত্তর, আমার মন এতো বড় নয়।

একটা সন্তান পালক নিতে চেয়েছি। এ ব্যাপারে তার উত্তর, পরের সন্তানের বাবা ডাক শুনবে, কেন? আরেকটা বিয়ে করলেই তো হয়।

প্রতি পদে পদে কানে বাজে *পচা ডিমে তা দিই না, অনেক দিয়েছি*।

একটা সংসারের জন্য, একটা সন্তানের জন্য কতো যে, শারীরিক, মানসিক, আর্থিক কষ্ট, অপমান, অবহেলা সহ্য করেছি তার ইয়ত্তা নেই। শুধু একটা কাজ পারিনি। সেটা হলো, কারো সঙ্গে স্বামী শেয়ার করতে। তাই ছয় মাস তার অপেক্ষা করে, সব রকম চেষ্টা শেষ করে নিজ থেকেই সরে গেলাম তার পথ সুগম করে।

এই দুনিয়ার কোনো আদালতে যাইনি। কারণ আমি বিশ্বাস করি, এই আদালতের ওপরেও আরেক আদালত আছে। সেখানে আমার হক পাওনা ও বিচার চাইবো আর জানবো, কোন অপরাধে পৃথিবীর কঠিনতম শাস্তি পেলাম। সন্তান না হওয়ার কষ্ট, বিয়ে ভাঙার কষ্ট, একা থাকার কষ্ট সব কিছু আমার জন্য মজুদ ছিল। এখন মনে মনে ভাবি, এতো অবহেলা ও অপমানের পর বার বার কেন তার কাছে ছুটে গেছি, সেটা কি তার প্রতি মায়া, দুর্বলতা, নাকি ভালোবাসা? জানি না, জানতেও চাই না।

এক সময় তার আসার সময় পার হয়ে ঘড়ির কাটা অন্যত্র গেলে চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি ঝরেছে, এক সপ্তাহ না এলে পাগল হয়ে গিয়েছি। এখন সেই আমি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস একা থাকছি। সব শেষ হয়ে যাওয়ার পরও মনে হয়, সে ভুলে আছে, ভুলিনি আমি।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা থেকে

বিয়ে

- এম এম রহমান সাকীব

বিয়ের জন্য পাত্রী দেখাদেখি চলছে মাস দুই হলো। এবং এ দায়িত্বে রীতিমতো নিয়োজিত রয়েছেন আমার সেজ কাকা ও তার বন্ধু মজিদ। কখন, কিভাবে, কোথা থেকে পাত্রী দেখা হলো এবং পাত্রীর আপদমস্তক বর্ণনা নিখুতভাবে মজিদ আমাকে পরিবেশন করতো। তার সুমিষ্ট বর্ণনা মুগ্ধ হয়ে শুনি আর বুকে বেড়ে যাওয়া ধুকধুকানী চেপে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করি। পাত্রী দেখার ফলাফল যাই হোক না কেন, ভূড়িভোজন যে রীতিমতো রাজকীয় এটাই তাদের কাছে দুর্লভ।

সর্বশেষ পাত্রী দেখা হল নায়ড়া গ্রামে। পাত্রী দেখতে ভালো। পারিবারিক সচ্ছলতা মন্দ নয়, এবং উচ্চ শিক্ষিতা। এমন পাত্রী কোনোক্রমেই হাতছাড়া করা যাবে না। পাত্রীপক্ষ আমাকে পছন্দ করে গেছে। এখন শুধু মহা ধুমধামে বিয়ের অপেক্ষায়।

আমাদের বাড়িতে বিয়ের আমেজ চলছে। হঠাৎ সংবাদ এলো ছেলে দেখতে চায় পাত্রী। যদি ছেলে দেখে পছন্দ হয় বিয়ে হবে, তা না হলে আত্মীয়তা এখানেই শেষ।

অকস্মাৎ এই সংবাদে বাড়ির সকলে হায় হায় করে উঠলো। পাড়ার মহিলাদের ভাষ্য, *কে বলে মেয়ে শস্তা! মেয়ের মতো মেয়ে হলে তার দাম আছে।*

আমার মেজাজটা বিগড়ে গেল। কি অসভ্য মেয়ের বাবা! আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে টানতে টানতে গিয়ে যেতে হবে তার কাছে আর সে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখবে এই সভ্য বলদটি আজীবন তার ঘানি টানতে সক্ষম কিনা। এ দেশে এরপর হয়তো মেয়েরা আসবে ছেলে দেখতে তার বাড়িতে। ছেলেরা মাথা নিছু করে উপর্যুপরি প্রশ্নের আঘাতে রক্তাক্ত হবে।

সর্বদা বাবা-মা, কাকাদের সম্মান করে চলি। সে হিসেবে আমার স্বপ্ন ছিল সহজ-সরল একটা মুখ, যে মুখে থাকবে না প্রতিহিংসার অসহ্য বুলি, যে চোখে থাকবে না ঝাঝালো কদর্য দৃষ্টি, যে ঠোটে থাকবে না মরুভূমির তপ্ত সাহারা। আমি চাই তার বিজলি রঙা হাসিতে যেন মুক্তা ঝরে। তার নুপুর বাধা পায়ের রিনিকঝিনিক শব্দে দুলে উঠবে বাগিচার ফুল। তার কোমল ছোয়ায় জীবন্ত হয়ে উঠবে প্রকৃতির সজীবতা, কণ্ঠে বাজবে মধুর গান, চোখের নদীতে ভালোবাসার ঢেউ প্রবল বেগে আছড়ে পড়বে আমার হৃদয় তীরে। আমি যে দুরন্ত আঘাতে মূর্ছা যাবো, শু-ধু মূর্ছা যাবো।

কিন্তু না, কেবলই চোখের সামনে ভেসে উঠছে মেয়েটির দুরন্তপনা যেখানে সরলতার কোনো ছাপ নেই। মনে হচ্ছে, অনেক পুরুষের জ্বালাময়ী দৃষ্টি তার বুকে কাপন জাগায়। তার চোখে পুরুষের যৌবনদীপ্ত রঙ লেগে আছে। বিশেষ করে বাবা–মাকে অবজ্ঞা করে পাত্র দেখতে চাওয়ায় বীভৎস, বিকৃত রূপ বার বার ভেসে উঠছে মনের পর্দায়।

বাড়ির সকলের পীড়াপীড়িতে আমাকে যেতে বাধ্য করা হলো। তবে সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে নিয়ে ফেলেছি, পাত্রী পছন্দ হোক আর না হোক, বিয়ে করবো না।

পাত্রীকে সামনে আনা হলো।

ঘরে মাত্র চারজন। আমি ও আমার বন্ধু এবং পাত্রী ও তার বান্ধবী।

সকলের প্রতি একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম।

বান্ধবীটি মিটি মিটি হাসছে। পাত্রীটি মাথা নিচু করে বসে আছে।

যেমনটি চঞ্চলা ভেবেছিলাম, আসলে ঠিক তেমনটি নয়। বাংলার রমণীরা লজ্জাশীলা হিসেবে পৃথিবীখ্যাত। আমি আশ্চর্যজনকভাবে লাজুক বাংলার অপরূপ রূপ তার মধ্যে দেখতে পেলাম।

কি নাম তোমার? প্রশ্ন করলাম।

চামেলি আক্তার ডলি। মিষ্টি জবাব।

তুমি কি আমাকে দেখতে চেয়েছিলে? ঝাঝালো প্রশ্ন।

এরপর মেয়েটি মুখ আরো নিচু করলো।

বান্ধবীকে বললাম, *আপনাদের জিজ্ঞাসা থাকলে করতে পারেন এবং মেয়ের মতামতটাও জানাতে পারেন। যেহেতু তার পছন্দই তো সব!*

বান্ধবীটি কাচুমাচু করে বললো, *খুব রেগে আছেন দেখছি*।

না, রাগ করবো কেন। রাগ করলে কি পাত্রীর সামনে নিজেকে দেখাতে আসতাম?

বান্ধবীটি মিষ্টি হেসে সায় দিল।

ডলি আমাকে পছন্দ করেছে। আজই বিয়ে হবে। শুভ কাজ দেরি করা ঠিক নয়। বাড়িতে সংবাদ পাঠানো হলো আমাকে ওখানে রেখেই। কেন জানি জেদ আমাকে ঘিরে ধরলো। আমি বিয়ে করবো না। কিন্তু বাবা–কাকার অগ্নিমূর্তি কল্পনা করে বুক ভেঙে কান্না পাচ্ছে। সকলের মধ্যে আনন্দের বন্যা আর আমার চোখে ব্যথার প্লাবন। আমি পরাজিত, আমার জেদের কাছে আমি পরাস্ত। প্রতিটি মুহূর্তে আমার খুব অসহায় মনে হলো।

বিয়ে হলো।

যখন বৌ নিয়ে বাড়িতে এলাম তখন ভোর প্রায় চারটে। লাল বেনারসি পরে বসে আছে ডলি। বুক সমান ঘোমটা টেনে নিচু মাথায়। ঝড় বয়ে যাচ্ছে আমার বুকের ভেতর। লণ্ড–ভণ্ড হয়ে যাচ্ছে সব কিছু।

হঠাৎ আমাকে অবাক করে ডলি আমার পা দুটো চেপে ধরলো।

ওগো আমাকে তুমি ক্ষমা করো। আমি জানি আমার ওপর তুমি রেগে আছো। বিশ্বাস করো আমি কখনো তোমার অবাধ্য হবো না।

অনুভব করলাম আমার বুকে হু হু শব্দে কি যেন দপ করে নিভে গেল। আমি তার অবনমিত মুখ সোহাগ ভরা দুটি হাতে আমার দিকে তুলে ধরলাম। দেখি সে কাদছে। তার অশ্রু ঝরনা হয়ে আমার হৃদয়ের সমস্ত কালিমা ধুয়ে মুছে ছাপ করে দিচ্ছে। আবেগে আপ্লুত ডলিকে আমার বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরলাম।

মহিষাকুড়া, শার্শা, যশোর থেকে

ওড়না

– সৈয়দ আব্দুল্লাহ ফারুখ রাজু

তখন আমি ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র। কলেজে আমার বন্ধুর সংখ্যা ছিল অনেক। কিন্তু কোনো বান্ধবী ছিল না। তাই সর্বক্ষণ একজন সংস্কৃতিমনা বান্ধবীর অভাব বোধ করতাম।

কিছু দিনের মধ্যেই এমন একজনকে আমার জীবনে আল্লাহ এনেছিল যে আমার বান্ধবী থেকে সহধর্মিনীতে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে। বর্তমানে আমরা একে অপরের বন্ধু। আর ভবিষ্যতের স্বামী এবং স্ত্রী।

ঘটনার শুরুটা ছিল এ রকম – আমার ফুপার বাসায় মেয়েটি তার পরিবারসহ ভাড়া থাকতো। মেয়েটির নাম ছিল তন্বী। ফুপার বাসায় যাতায়তের ফলে প্রায়ই মেয়েটির সঙ্গে দেখা হতো। চোখে চোখ রাখতাম।

এ রকম চোখ রাখারাখি হলে সে লজ্জায় চোখ সরিয়ে নিতো। ফলে চোখ সরিয়ে নিতাম আমিও।

ফুপার বাসার কেয়ারটেকার আমাদের এই চোখাচোখি দেখে ফেলতো। সেই আমার সকল সমস্যার সমাধান করে দিল। আমার সঙ্গে তন্বীও তখন এইচএসসি পরীক্ষার্থিনী ছিল। কেয়ারটেকারকে আমি চাচা বলে সম্বোধন করতাম। চাচা খুব রসিক এবং মজার লোক ছিলেন। চাচার সঙ্গে তন্বীর বেশ খাতির ছিল।

চাচার সঙ্গে সম্পর্ক আমারও বেশ ভালো ছিল। একদিন হঠাৎ চাচাকে বললাম, চাচা, তন্বীর কাছে একটা চিঠি লিখতে চাই। সেটা ও পড়তে এবং উত্তর দিতে রাজি আছে কি না একটু জেনে আসবেন।

চাচা বললেন, ঠিক আছে।

পরদিন আমাকে এসে বললেন, হ্যা ও রাজি হয়েছে।

আমি তো খুশিতে আটখানা। এতোটুকু অনুমতি তন্বীর কাছ থেকে পেয়ে আমার মনে হচ্ছিল এই মুহূর্তে আমার মতো সুখী ব্যক্তি পৃথিবীতে কেউ আছে কি? এই সংবাদ পেয়ে সারাটা দিন যে আমার কিভাবে পার হলো নিজেই জানি না। রাতে গদ্য এবং পদ্যের মিশেল দিয়ে বিশাল এক প্রেমপত্র লিখলাম উত্তর এবং তন্বীর সম্মতি পাওয়ার আশায়। তারপর সকালে চাচা এলে তাকে দিয়ে প্রেমপত্র পাঠালাম।

তিনি পত্র দিয়ে ফিরে এসে যা বললেন তাতে আমার মেজাজ ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। রাগে, অপমানে নিজের ওপর নিজেরই ভীষণ রাগ হলো।

তন্বী আমার চিঠিটি হাতে পাবার সঙ্গে সঙ্গেই এক নিঃশ্বাসে পড়ে ছিড়ে বাসার চৌবাচ্চার পানিতে ফেলে দিয়েছিল। তাচ্ছিল্যর হাসি দিয়ে চাচাকে বলেছিল, এতোটুকু পিচ্চি ছেলে লিখতে পারে না, আবার প্রেমও করতে চায়। শখ তো কম না।

চাচার মুখে এটা শোনার পর আমার জেদ আরো বেড়ে গেল। মনে মনে বলেছিলাম, শোনো মেয়ে, আমিও তোমাকে ছেড়ে দেয়ার পাত্র নই। তোমার অহংকার ধূলায় মিশিয়ে দেবো।

পরীক্ষার কিছু দিন আগে তন্বীকে দেখলাম মার্কেটে একটা কসমেটিক্সের দোকানে জিনিসপত্র কিনছে। হাতের ইশারায় ওকে ডাকলাম। ভেবেছিলাম আসবে না।

এরপর আমাকে অবাক করে দিয়ে দেখলাম ও আমাদের দোকানের দিকে আসছে। ধুক ধুক করে কাপতে লাগলো আমার বুক। নিজেকে ওর সামনে বেশ অপ্রস্তুত লাগছিল। আমাদের দোকানে এসে বললো, আপনি কি আমায় ডেকেছেন?

বললাম, জি।

কেন ডেকেছেন?

আপনার সঙ্গে একটু কথা বলবো।

কতো সময় লাগবে?

পাচ মিনিট।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে বললো, এতো সময়?

আপনি ব্যস্ত থাকলে দরকার নেই।

শেষ পর্যন্ত সে রাজি হলো।

তখন ছিল গোধূলি লগ্ন। আধো আলো আধো অন্ধকার। বললাম, ভেতরে আসুন।

ও ভেতরে এলে পাশাপাশি বসতে চেষ্টা করছিলাম। আমি যতোই ওর পাশে বসতে চেষ্টা করি, ও ততোই দূরত্ব বাড়ায়। এক পর্যায়ে জোর করেই ওর পাশে বসলাম। বললাম, আপনার হাতটা আমাকে দেন।

ও হাতটা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে।

ওর হাতের ওপর হাত রেখে বললাম, বলো তুমি আমাকে ভালোবাসো।

এতোটুকু সময়ের মধ্যে আমি ওকে তুমি বলতে শুরু করেছি!

ও বললো, পরীক্ষার পর আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবো।

না, এখনই বলতে হবে।

ও কিছুই না বলে চুপচাপ নিচের দিকে তাকিয়ে বসে থাকলো।

আস্তে করে ওর মুখে হাত দিলাম। এবং কিছু বুঝে ওঠার আগেই লিপ কিস করলাম।

ও উঠে দাড়িয়ে আমাকে বললো, অসভ্য ছেলে। ছোটলোক, মেয়েদের ঠোটে চুমু খেতে লজ্জা করে না? বিয়ে করে তারপর বৌকে চুমু খেতে হয়।

বোকার মতো দাড়িয়ে ওর কথাগুলোকে হজম করছিলাম। ও হনহনিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল। ভেবেছিলাম আজ থেকে বুঝি ও আমাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করবে। রাতে কেয়ারটেকার চাচা এলে তাকে সব খুলে বললাম। এবং তন্বীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে নিজের ভুল স্বীকার করে চিঠি লিখলাম। ভেবেছিলাম ও বোধহয় উত্তর দেবে না।

পরদিন দেখলাম হাতে দুটি গোলাপ এবং একটা চিঠি নিয়ে নিজেই আমার সামনে হাজির!

আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।

ও আমাকে ওগুলো দিয়ে একটু মিষ্টি হেসে চলে গেল।

চিমটি দিয়ে নিজেকে দেখছি স্বপ্নে দেখছি, না তো?

এরপর চিঠিটি খুলে দেখলাম মাত্র চার লাইনের একটা চিঠি । শুরুটা ছিল এ রকম :

শুনুন, আপনি যদি আমাকে সত্যি সত্যিই ভালোবেসে থাকেন তাহলে আমিও আপনাকে ভালোবাসি। আপনি আমাদের বাসায় বেড়াতে আসবেন।

ইতি – তন্বী।

সামান্য কয়টি কথা লেখা মনে হয় এক হাজারবার সারা দিনে পড়েছি। বার বার পকেটে রাখতাম আর খুলে খুলে পড়তাম।

এ চিঠি পাবার দুদিন পরই ওদের বাসায় ঢুকলাম। দেখলাম পিঠে রোদ লাগিয়ে উল্টাদিকে মুখ করে বসে আছে। তার বাতাসে উড়ছে ওর এলোমেলো চুলগুলো। প্রকৃতির সঙ্গে ওর চুলের সৌন্দর্য দাড়িয়ে দাড়িয়ে উপভোগ করেছিলাম। কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে গিয়েছিলাম গানের রাজ্যে। দ্বিজেন মুখার্জির একটি গান ভীষণ মনে পড়ছিল তখন।

শ্যামল বরনী ওগো কন্যা
এই ঝির ঝির বাতাসে ওড়াও ওড়না
মেঘের আলোক দোলায় কোথা যাও
কতো হাসির ফোয়ারা তোমার ঝরনা।

হঠাৎ ওকে ডাকলাম।

ও আমাকে দেখেই লাফ দিয়ে উঠে বললো, আরে আপনি, ভেতরে আসেন।

ভেতরে গেলাম।

ও কথা বলছে না।

আমিও কথা বলছি না। মৌনতা ভাঙালাম। বললাম, কেমন আছো?

ও কিছুই বললো না।

আমি আস্তে করে ওর মুখটা আমার হাতের মধ্যে নিয়ে ওর ঠোঁটে আমার ঠোঁট দিয়ে আলতো পরশ বুলিয়ে দিলাম।

তবুও কিছু বললো না।

আমিও কোনো কথা না বলে চলে এলাম।

পরীক্ষার আর দেরি নেই। পড়াশোনার জন্য কোনো যোগাযোগ করতে পারলাম না। তন্বীও কোনো যোগাযোগ করলো না।

পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। তবুও ওর কোনো সাড়া-শব্দ নেই। আমিও ওর সাড়া না পেয়ে নিশ্চুপ। এরপর রেজাল্টের আগ পর্যন্ত কোনোই যোগাযোগ নেই।

রেজাল্ট হলো, দুজনেই বেশ ভালোভাবেই এইচএসসি পাস করলাম। এর মধ্যে ওর বাবার ট্রান্সফারের সংবাদ শুনলাম। খুব দ্রুতই ওরা ট্রান্সফার হয়ে চলে গেল।

চলে যাবার আগে ওই চাচার মাধ্যমে সংবাদ পাঠালো আমাকে দেখা করার জন্য।

গিয়ে দেখি চুপচাপ বসে আছে। বললাম, তোমরা তো চলে যাচ্ছো, আমাকে কি মনে রাখবে?

আমি মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আপনাকে পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করবো।

কথা দিলাম আমি মনে রাখবো। আর তুমি এমন একটি জিনিস আমাকে দেবে যাতে আমি তোমাকে মনে রাখতে পারি।।

ও আমাকে কচি কলাপাতা রঙের একটা ওড়না দিয়ে বললো, এটা রেখে দেবেন। যখন আমার কথা মনে পড়বে, এটা বের করে দেখবেন।

আমিও ওটা ওর হাত থেকে নিয়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এলাম। রাতে যখন ঘুমুতে যেতাম তখন ওর দেয়া ওড়নাটা বুকে জড়িয়ে ঘুমাতাম। আবার সকালে ঘুম থেকে উঠে সযতনে তুলে রাখতাম।

সেই ২০০২ সালে ওরা চলে গেল। আজ পর্যন্ত আমি ওর অপেক্ষাতেই আছি। সেই থেকে কোনো মেয়ের দিকে তাকাই না।

এর কিছু দিন পরই আমার আব্বা চলে গেলেন ইহজগৎ ছেড়ে না ফেরার দেশে। সব দায়িত্ব পড়লো আমার কাধে। পাশাপাশি চালিয়ে যাচ্ছিলাম পড়াশোনাটাও। এখনো আমি বেশ আছি ওর স্মৃতিকে বুখে আগলে রেখে।

মাঝে মধ্যে তন্বীর সঙ্গে আমার Voice Contact হয়। ও এখনো ওর সিদ্ধান্তে অবিচল। আমাকে ছাড়া ও পৃথিবীর কিছুই বুঝতে চায় না। এখনো আমি অপেক্ষার প্রহর গুণছি সেই মাহেন্দ্রক্ষণের যেদিন আমি আপন করে পাবো ওকে। এখন পর্যন্ত ওর দেয়া ওড়নাকে বুকে চেপে কষ্টগুলোকে ভুলে থাকি। এ জন্য আমাদের ভালোবাসার নাম দিয়েছি *ওড়না ভালোবাসা*।

মোহাম্মদপুর, মাগুরা থেকে

ব্যতিক্রমী

– আহম্মেদ শিশির

পাচ বোনের পরে পৃথিবীতে আগমন আমার তাই আদর যত্নের একটুও কমতি ছিল না। বরং অনেক সময় আমার বোনেরা দশবার চেয়েও যা পেতো না, আমার বেলায় না চাইতেই হস্তগত হতো। বাবা, মা, বোনেরা, আত্মীয়স্বজন সবাই খুব আদর করতেন।

বাবা, মায়ের একান্ত ইচ্ছে আমাকে ডাক্তার বানাবেন। সে অনুযায়ী আমার পড়ালেখার জন্য কাড়ি কাড়ি টাকা খরচ করতে আমার শিক্ষক বাবা মোটেও কার্পণ্য করেননি।

দুঃখ কি তা একদমই জানা ছিল না। কিন্তু যেদিন দেখলাম মেডিকাল কলেজ ভর্তি পরীক্ষার রেজাল্ট শিটে আমার রোল নাম্বার নেই সেদিন থেকেই চারিদিক থেকে হতাশা, ব্যর্থতার যন্ত্রণা আমাকে আহত করতে লাগলো। যে আমি লেখাপড়া ছাড়া কিছুই বুঝতাম না সে কি না লেখাপড়া প্রায় ছেড়েই দিলাম। পড়ালেখার প্রতি এক প্রকার রাগ, ক্ষোভ, অভিমান জন্মালো। ফলে কোথাও ভর্তি হলাম না। এই গোপন সত্যটি বাবা মাকে জানাতে পারিনি তাদের কষ্টের কথা ভেবে। বরং আরো মিথ্যা রটালাম ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র হিসেবে। এদিকে চরম সত্য কথা হলো আমি যাত্রাবাড়ীর একটি মেসে থাকি। দুইটি টিউশনি করে কোনো রকমে দিনাতিপাত করি।

নতুন *মেস মেম্বার আবশ্যক* এই বিজ্ঞাপন দেয়ার পরে আমাদের মেসে ডালিম নামের একজন সুদর্শন, সুশিক্ষিত, স্মার্ট, সাহসী, স্পষ্টভাষী এবং সুমিষ্টভাষী লোকের আগমন ঘটে। প্রথম থেকেই লক্ষ্য করছিলাম, ডালিমভাই গায়ে পড়েই আমার সঙ্গে কথা বলতে চান। তবুও কেন জানি যতোটা সম্ভব তার থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু তার চোখের ভাষা, সত্যবাদিতা, দেশপ্রেম, ন্যায়পরায়ণতা এক সময় আমাকে তার প্রেমের নদীতে তরী ভেড়াতে বাধ্য করলো। আমি নিজের কাছে পরাজিত হলাম। ফলে তার সঙ্গে আমার অলিখিত ব্যতিক্রমী প্রেম তৈরি হলো। এক মুহূর্তও তাকে না দেখলে কেমন যেন সব ফাকা মনে হতো।

তিনিও আমার মতো সর্বদা আমাকেই ভাবতেন।

ফলে তার যে কোনো কাজের সঙ্গী হতাম।

তিনি ছিলেন তার থানার যুবদলের সভাপতি। কিন্তু কিছু কুচক্রী ব্যক্তির স্বার্থে তিনি বাধা হয়ে দাড়ালে তারা তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করেন। এই অবস্থায় তিনি ঢাকা চলে আসেন এবং আওয়ামী লীগে যোগদান করে। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণে খুব অল্প সময়েই তিনি রাজনীতির পাশাপাশি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও উন্নতি করতে লাগলেন। তার উন্নতিতে ভীষণ খুশি হলাম। কারণ লোকটিও আমাকে ভীষণ ভালোবাসেন স্নেহ করেন।

দুই মাস যাত্রাবাড়ীতে থাকার পর তিনি আমাকে নিয়ে নয়া পল্টনে দুই রুমের একটি বাসা নিলেন।

যেদিন প্রথম নতুন বাসায় উঠলাম সেদিন তিনি আমার হাতে হাত রেখে বললেন, যেভাবেই হোক তোমাকে ডিগ্রি পাস করতেই হবে। এর জন্য যতো ত্যাগ স্বীকার করতে হয় আমি করবো, তোমার মতো এতো মেধাবী ছাত্র ডিগ্রি পাস না করলে এই দেশে প্রকৃত মেধার মূল্যায়ন হবে না। আমি তোমার অজান্তে তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলাম, তোমার বাবা–মায়ের সঙ্গে তোমার সব বিষয়ে খোলাখুলি আলাপ করেছি, তাদের ইচ্ছে যেভাবেই হোক তোমাকে বিএসসি পাস করতে হবে। তোমার বাবা মা আমাকে তাদের বড় ছেলে হিসেবে তোমাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। এখন তুমি আমাকে কথা দাও তুমি আমার কথা মতো চলবে কি না?

আমার প্রতি তার অকৃত্রিম ভালোবাসা দেখে সেদিন দুই চোখ পানিতে ভরে উঠেছিল। আমার বুক ভাঙা কান্না সহ্য করতে না পেরে তিনি আমাকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরলেন।

তার লোমশ ভরা বুকে সেদিন যে ভালোবাসার প্রশান্তি পেয়েছিলাম, জানি না কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে তার একাংশও পাওয়া যাবে কি না। এভাবে কতোক্ষণ যে তার বুকের সাথে লেপ্টে ছিলাম তা আজও অজানা।

তার প্রবল উৎসাহ, উদ্দীপনা আর ভালোবাসার বিশ্বাসে বিএসসি-তে ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করলাম। তাকে সংবাদ দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম তার চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে। আমাকে সঙ্গে করে *মিডনাইট*-২ চায়নিজ রেস্টুরেন্টে ঢুকলেন, খাবার খাওয়ালেন।

আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, আসছে ভালোবাসা দিবসে আমিও তাকে কিছু গিফট করবো। সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নিলাম। তাকে আগেই বলে রেখেছি, ভালোবাসা দিবসের সবটুকু দিন যাতে আমার জন্য বরাদ্দ থাকে। সে অনুযায়ী ভালোবাসা দিবসের প্রথম সকালে তাকে এক গোছা রক্তগোলাপ দিয়ে শুভেচ্ছা জানাই। তারপর ট্যাকসি ক্যাব নিয়ে সোজা জাতীয় স্মৃতি সৌধ। সেখানে গিয়ে দেখি অসংখ্য যুগল নিজেদের মধ্যে মগ্ন। আমিও তাকে নিয়ে একটি মাঝারি সাইজের গাছের আড়ালে বসলাম।

তিনি খুবই লজ্জা পাচ্ছিলেন।

বুঝতে পারলাম তিনি ভীষণ সাহসী হলেও এখানে সে ভীরু। আমি তার ডান হাতের আঙুলগুলো আস্তে আস্তে নাড়ালাম আর বললাম চোখ বন্ধ করুন। তিনি চোখ বন্ধ করলে আমি তার অনামিকায় আমার ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ একটি আংটি পরিয়ে দিলাম।

কিন্তু তিনি চোখ খুলে মুখে কিছু না বলে আমাকে অবাক করে দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে দুই ঠোঁট চুমু খেতে খেতে উম্মাদ করে তুললেন।

আমি একটু স্বাভাবিক হয়ে দূরে সরতেই তিনি লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে নিলেন।

তাকে অভয় দিলে বললাম, লজ্জার কি আছে, এটা তো ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। তাছাড়া আমি মেয়ে হলেতো আপনাকেই বিয়ে করতাম।

তিনিও আমার কথার পুনরাবৃত্তি করে বললোন, তুমি মেয়ে হলে আমি তোমাকেই বিয়ে করতাম।

এমনিভাবে আমাদের ভালোবাসায় বয়স ছয় বছর হলো। এখন তার বাবা-মা তাকে বিয়ের জন্য পীড়াপীড়ি করছে কিন্তু তিনি কোনো জবাব দেন না, এমনকি আমাকেও না। তাকে বিয়ের কথা বললে তিনি শুধু জবাব দেন, আমার ভালোবাসা আমাকে ফিরিয়ে দাও, কেন তুমি মেয়ে হয়ে জন্মালে না?

তার জবাব শুনে মনে ভীষণ কষ্ট পাই, হে খোদা! কেন তুমি আমাকে তার বুকের পাজর দিয়ে বানালে না।

তার একান্ত প্রচেষ্টা আর আমার যোগ্যতায় আজ আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন কর্মচারী।

আমার বাবা-মা প্রায় বৃদ্ধ। আমাকে বিয়ের জন্য তারাও পীড়াপীড়ি করছেন এখন কি করবো কিছুই ভেবে পাই না। তার কাছে এখন বিয়ের কথা বলার পূর্বেই আমার বুকটা এক চাপা আগুনে জ্বলেপুড়ে যায়। তার কষ্টের কথা ভেবে প্রতিদিন চুপ থাকি। জানি না এই ব্যতিক্রমী প্রেমের শেষ পরিণতি কি হবে?

শাহরাস্তি, চাদপুর থেকে

প্রেমের শক্তি

– উইলিয়াম এলিয়ট গ্রিফিথস

জাপানের হিদাকা নদীর ধারে একটি সুন্দর উপত্যকা ছিল। সেই উপত্যকার মাঝে ছিল একটি সুন্দর চায়ের বাগান। সে বাগানের চারদিকে ছিল ঘন বনে আচ্ছন্ন কতোকগুলো পাহাড়। পাহাড়গুলোর মাঝখান দিয়ে বয়ে যেতো কতো রূপালি ঝর্না।

বহু প্রকৃতি প্রেমিক মানুষ বেড়াতে যেতো সেই পাহাড় আর ঝরনার দেশে। কতো কবি সেখানে গিয়ে কবিতা লিখতেন, কতো সাধু–সন্ন্যাসী সেখানে গিয়ে ধ্যান করতেন নির্জনে। কতো আনন্দ উচ্ছল মানুষের দল সেখানে বনভোজন করতে গিয়ে গিটার ও ড্রাম বাজিয়ে নাচগান করতো।

চা বাগানটা ছিল হাতে আকা ছবির মতো সুন্দর ও সাজানো। তার মধ্যে ছিল ছোট কৃত্রিম পাহাড়, ঝরনা, ছোট পাইন গাছের কুঞ্জবন, ঘাসে থাকা প্রান্তর আর উপত্যকা। তার মাঝখানে ছিল একটা কৃত্রিম হ্রদ। তাতে অনেক পদ্ম ফুল ও সোনালি ছোট মাছ ভর্তি। এখানে–সেখানে জলের মধ্যে থেকে দুই একটা কাছিমের নাচ দেখা যায়। এই চা বাগানের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে দূর–দূরান্তে। অনেক দর্শক আসতো, বিশেষ করে যারা প্রকৃতির সৌন্দর্য ভালোবাসতো তারা দলে দলে এসে ভিড় করতো চা বাগানে।

চা বাগানের বাড়িটার বারান্দা থেকে নদীর ওপারে লম্বা ফার গাছের মাঝখানে একটা বৌদ্ধ মন্দির দেখা যেতো। সেই মন্দিরের কাছাকাছি একটা লাল প্যাগোডা দেখা যেতো গাছের ফাকে ফাকে। সেই বৌদ্ধ মঠটার মধ্যে কাগজের বোর্ডের জানালা, কাঠের দেয়াল আর টালির ছাদওয়ালা কতোকগুলো ঘর। মঠের মধ্যে থাকতো লাল মুখ এবং শাদা ভ্রূ বিশিষ্ট এক অধ্যক্ষ ও কুড়িজন যাজক। তাদের সকলের মুখ আর মাথা কামানো ছিল। তাদের পরনে ছিল গেরুয়া কাপড় ও বেতের চটি। তাদের একমাত্র পানীয় ও খাদ্য ছিল জল এবং শাকসবজি।

সারি বাধা পাথরের লণ্ঠন আর ব্রোঞ্জ প্রতিমূর্তির মাঝখানে পাথরের চত্বরের ওপর ছিল এক ঘণ্টা ঘর। সেই ঘরের ছাদের তলায় ঝোলানো ছিল দশ ফিট উচু এক ব্রোঞ্জের ঘন্টা। এই বিশাল ঘন্টাটি ছিল দুই ইঞ্চি পুরু। তার ওজন ছিল কয়েক টন।

এদিকে নদীর এপাড়ে চা বাগানের মধ্যে যে বাড়ি ছিল সে বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও দর্শনীয় বস্তু ছিল বাগানের মালিকের মেয়ে কিও। এই কুমারী মেয়েটির বয়স ছিল আঠারো বছর এবং সে ছিল চেরি ফুলের কুড়ির মতো। চাদের আলোভরা কোনো গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় মৃদুমন্দ বাতাসে দুলতে থাকা বাশের কলির মতো সুন্দর এবং এক অপূর্ব সুষমা মণ্ডিত। পাহাড় থেকে ছুটে আসা বাতাসে ভাসতে থাকা শ্বেতপত্রের সুগন্ধের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল কিওর রূপের খ্যাতি। সে যখন বাগানে কাজ করতো অথবা মাদুরে মোড়া মেঝের ওপর শুয়ে থাকতো বা সন্ধ্যায় লণ্ঠনে আলো জ্বালাতো তখন তাকে দেখে কামনায় উত্তাল হয়ে উঠতো অনেক যুবকের হৃদয়।

বৌদ্ধ মঠের সন্ন্যাসীরা কেউ মাছ মাংস খেতে পেতো না, চা বাগান দিয়ে আসতে পারতো না। সন্ন্যাসীদের মধ্যে একটি যুবক এই নিয়মগুলো মেনে চলতো। সে অনেক পরিশ্রম ও যত্নের সঙ্গে পড়াশোনা করতো। চরিত্রের শুচিতা ও জ্ঞানবিদ্যার গভীরতার দিক থেকে তার সঙ্গে মঠের অন্য কোনো সন্ন্যাসীর তুলনায় হতো না।

একদিন এই যুবক সন্ন্যাসী যখন অন্য এক মঠ থেকে ফেরার সময় চা বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ সে দেখতে পেয়ে যায় কিও–কে। যুবকটি মঠের আস্তানায় ফিরে সে রাতে আর ঘুমোতে পারলো না। এক অনির্দিষ্ট, অব্যক্ত ব্যথায় বার বার বিদ্ধ হতে থাকলো তার বুকের ভেতরটা।

একদিন অন্য কোনো অজুহাত না পেয়ে সোজা চা বাগানের বাড়ির মধ্যে ঢুকে গিয়ে কিছু জলখাবার চাইলো যুবক সন্ন্যাসী।

কিও–ই তা আনলো। আগুন থেকে যেমন আগুন জ্বলে উঠে তেমনি যুবক সন্ন্যাসীর বুকের মধ্যে জ্বলতে থাকা অতৃপ্ত প্রেম ও কামনার আগুন থেকে কিও–র বুকে জ্বলে উঠলো অনুরূপ আগুন। এরপর থেকে প্রায় দিনই রাতকালে নদী পার হয়ে চা বাড়িতে এসে কিওর সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে যেতো সে।

এভাবে কয়েক মাস যাবার পরে অনুশোচনা জাগলো যুবকের মনে। দ্বন্দ্ব লাগলো তার হৃদয়াবেগ ও প্রেমাবেগের মধ্যে। সে ভাবলো, হঠাৎ তাদের সম্পর্কের ছেদ না টেনে ধীরে ধীরে বলবে কথাটা কিওকে। তবে সে কিওর কাছে যাওয়াটা কমিয়ে দিল।

এদিকে কয়েকদিন রাতের বেলায় তার প্রেমিক না আসায় রাগে আগুন হয়ে উঠলো কিও।

সে দূর পাহাড়ে প্রতিহিংসার দেবতা ফুদোর কাছে চলে গেল। সে দেবতার কাছে প্রার্থনা করলো, হয় আমার প্রেমিকের অন্তরের পরিবর্তন করো, না হলে তাকে ধ্বংস করার পথ বলে দাও আমাকে।

এরপর কিও জাদু বিদ্যা শিখতে গেল কাম্পিরার মন্দিরে। সে প্রার্থনা করলো, এমন এক জাদু বিদ্যা যেন শিখতে পারে যার বলে ইচ্ছা করলেই ড্রাগনের মতো ভয়ংকর সাপে পরিণত করতে পারে নিজেকে। এভাবে সে যেন তার শত্রুর দেহটাকে তাড়িয়ে তার হাড়গোড় সব ভেঙে ফেলতে পারে। এরপর থেকে পার্বত্য অপদেবতাদের কাছ থেকে জাদু বিদ্যা শিখতে যেতো রোজ রাতে।

যুবক সন্ন্যাসী তার প্রেমিকা কিওর কাছে আসা কমিয়ে দিতে দিতে অবশেষে একদিন বিদায় নিতে এলো তার কাছে।

সেদিন রাতে কিও চোখের জলে অনেক অনুনয়-বিনয় করলো। কিন্তু কোনো ফল হলো না।

যুবক বললো, এই তাদের শেষ দেখা।

সহসা কিওর চোখ দুটো আগুনের মতো জ্বলতে লাগলো। দেখতে দেখতে সে হয়ে উঠলো ড্রাগনের মতো ভয়ংকর এক সাপ। ভয়ে পালিয়ে গেল যুবক সন্ন্যাসী। মঠে গিয়ে সেই বড় ঘন্টার মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে থাকলো।

এদিকে কিও ড্রাগনের রূপ ধরে মঠে গিয়ে সেই ঘন্টাটাকে জড়িয়ে ধরে থাকলো।

ফলে যুবক সন্ন্যাসী বের হতে পারলো না ঘন্টার ভেতর থেকে।

ড্রাগন রূপিণী কিওর নিঃশ্বাস থেকে যে আগুন ঝরছিল সেই আগুনে ধীরে ধীরে গলে যেতে লাগলো ঘণ্টাটা।

যুবক সন্ন্যাসী অনেক প্রার্থনা করলো ভেতর থেকে। দৈত্য নাশের জন্য বুদ্ধ-র কাছে অনেক প্রার্থনা করলো সে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। ব্রোঞ্জের ঘন্টাটা কিওর নিঃশ্বাসের আগুনে গলতে গলতে অবশেষে পড়ে গেল মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে ঘন্টার ভেতরে যুবক সন্ন্যাসী আর বাইরে কিও দুজনেই পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

ওয়ার্ল্ড ক্লাসিকস-এর সৌজন্যে

সংগ্রহে ***অনু***

সাধুর মোড়, রাজশাহী থেকে

প্রকৃত প্রেমিক

– মুহাম্মদ সোলাইমান হোসাইন

লেখক, পাঠক, কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক সকলেই আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন প্রেমের সংজ্ঞা দেয়ার জন্য। কেন জানি আমার মনে হয় প্রকৃত প্রেমের সংজ্ঞা কারো জানা নেই। কারণ জ্ঞান হবার পর থেকেই দেখছি পবিত্র প্রেমের নামে রুচিহীন মানুষের অশ্লীল, অবৈধ কার্যক্রম। পৃথিবীটা যেন একটা প্রেম নগর। আকাশে-বাতাসে প্রেমের সৌরভ ভেসে বেড়াচ্ছে আপন গতিতে, অথচ প্রকৃত প্রেম বিরল।

কাউকে যদি প্রশ্ন করা হয় প্রকৃত প্রেমিক কে? নির্দ্বিধায় শত নামের ঊর্ধে মজনু কিংবা শাহজাহান বলা হবে। আমি বলবো, ওরা প্রকৃত প্রেমিক নয়। একজন লাইলী লাইলী করে মূল্যবান জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। অপরজন মমতাজ-এর নামে স্মৃতিসৌধ গড়েছেন। এ জন্য তাদেরকে প্রকৃত প্রেমিকের সার্টিফিকেট দেয়া যাবে না।

তবে আমি ছ্যাকা খাওয়া প্রেমিক নই। প্রেমের বিপক্ষেও আমি নই। আপনারা প্রাণ খুলে ভালোবাসুন নারী কিংবা পুরুষকে। ভালোবাসুন জড় জীব জগতের যাকে ইচ্ছে। আমার কোনো আপত্তি নেই। সৃষ্টি জগতের সব কিছুই স্রষ্টা নিজ হাতে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে সৃষ্টি করেছেন।

আজব ও নিপুণ সৃষ্টির নাম নারী। তাই বলে নারীকে ভালোবেসে জীবন বিসর্জন দেবেন এটা তো হয় না। সৃষ্টিকে ভালোবেসে স্রষ্টাকে ভুলে যাবেন তাও অমার্জনীয়। সৃষ্টির জন্য স্মৃতিসৌধ গড়বেন, অথচ স্রষ্টার ঘর বানাবেন না তা কি করে হয়?

সুতরাং সষ্টি জগতের কাউকে ভালোবাসার ফাকে সৃষ্টিকর্তাকেও ভালোবাসুন। স্রষ্টার জন্য মসজিদ, মন্দির, গির্জা গড়ুন। তাহলেই আপনার প্রেম হবে সার্থক। আপনার জীবন হবে পরিপূর্ণ। তখনই আপনি হবেন একজন প্রকৃত প্রেমিক।

সউদি আরব থেকে

অনুভবে তুমি হৃদয়ে তুমি

– কুমু

মম সুন্দরতম, আমার ভালো লাগার ছোট অনুভূতি, ততোধিক ছোট সুখ অথবা আমার দুঃসহ একাকী জীবনের সহস্র কষ্টের ভগ্নাংশতম প্রায়ই তোমাকে লিখি চিরকুটসম *নোট স্লিপে*। তুমি তা পড়ে আমারই সম্মুখে এবং তখনি হাত বাড়িয়ে ফেরত দাও টেবিলের অপর পাশে বসে থাকা এই আমাকেই। আর ওই সব চিরকুটের জবাব পাঠ করি আমি তোমার চোখের ভাষায়, ভাষাহীন অভিব্যক্তিতে। আমার শূন্য হৃদয় ভরে ওঠে তোমার না বলা কথার ভালোবাসায়।

আজ লিখছি তোমাকেই অনেক বড় পরিসরে। এর পাঠক শুধু তুমি নও, শত শতজন। অথচ আমাদের এই এতো সুন্দর সম্পর্কটা কেউ জানবে না। বাস্তবের আলোর মুখ দেখবে না, কোনো দিন না। কারণ পারিবারিক, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক মান–সম্মানের কাছে তা অসুন্দর, হয়তো বা অপরাধও। তাই তো নিজ নিজ নৈতিকতায় অলিখিত এক প্রতিশ্রুতি মেনে চলি আমরা প্রতিনিয়ত। অভাগা আমি যা চাই না তা ভুল করে পাই, যা জোটে তা পাওয়ার অধিকার রাখি না।

আমাদের সম্পর্কটা একটু অন্য রকম। শুধুই অনুভবে তুমি আর আমি। স্বভাবসিদ্ধ এক হাস্যেজ্জ্বল সুখী মানুষ তুমি। নিত্যদিনের সাক্ষাতে তো অবশ্যই, এমনকি জনবহুল কর্মব্যস্ততার ভিড়ে কারণে–অকারণে প্রায়ই উপহার পাই তোমার ওই অমলিন সুন্দর অপাপবিদ্ধ হাসিটি। প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যেও একবার দেখে নাও আমাকে সবার অলক্ষ্যে, কেমন আছি আমি। কখনো বা সে দৃষ্টিতে থাকে জিজ্ঞাসা অথবা প্রচ্ছন্ন দুষ্টুমি কিংবা খুব ছোট সংক্ষিপ্ত বাক্য বা একটা শব্দ ব্যবহার করো যা সুন্দর ও বহুমাত্রিক অর্থবোধক। কেউ বুঝতে পারে না, অথচ মুহূর্তেই তুমি আমার হৃদয়ে স্থান নাও।

তুমি যে আমার সায়াহ্ন সৈকত। জীবনের এই যে প্রান্ত সীমায় এসে তোমাকে পেয়েছি। না, পেয়েছি ঠিক নয়, তুমিই আমায় কাছে টেনে নিয়েছো। চিরবঞ্চিত এই দুঃখী মানুষটাকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দেবে তুমি। এ আমি কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি। পরিবেশ পরিস্থিতিগত কারণে এ রকম ভাবনার কোনো অবকাশও ছিল না। তোমার প্রতি আমার আগ্রহ তুমিই তৈরি করেছো খুবই ধীরে, ছিল না কোনো উদ্দেশ্যপূর্ণ তাড়াহুড়ো। আমার পর্বত প্রমাণ কষ্টগুলো বিচ্ছিন্ন অথবা প্রাসঙ্গিক বর্ণনায় ছোট মানসিক আশ্রয় তোমার কাছে পেতাম, এখনো পাই। অসীম শূন্যতার মাঝে এ এক পরম পাওয়া। সারা জীবনের বঞ্চনার এ হয়তো বিন্দুবৎ যৎসামান্য। তাতে কি, আমার অনুভবে তুমি অসামান্য। অসম্ভব এক সুন্দর মানুষ তুমি।

লক্ষ্য করেছি, শুধু আমি নই – যে কেউ-ই তোমাকে খুব সহজেই আপনভাবে নিজের একান্ত ব্যক্তিগত সমস্যা অবলীলায় তোমার কাছে ব্যক্ত করে, সমাধানে নিঃশংকচিত্তে তোমার শরণাপন্ন হয়। তোমার আচরণে, ব্যক্তিত্বে এমন কিছু আছে নির্ভর করার মতো, নিশ্চিন্তে বিশ্বাস করার মতো। আমার ধারণা, তোমার আপন-পরিজন বেষ্টিত নিজের ঘর খুবই শান্তিময়। ভালোবাসা, মমতা, দায়িত্বশীলতায় কানায় কানায় পূর্ণ। কাছ থেকে দেখতে ইচ্ছা করে খুব।

এক পরাজিত জীবন আমার। বিশ্বাসহীনতা আর প্রতারণার কালো দংশন আমার হৃদয়ে গভীর ক্ষত তৈরি করে দিয়েছে। কাধে দায়িত্বের জোয়াল টানা জীবনের জন্য অনিবার্য যুদ্ধের জটিল গলিপথ হাটতে গিয়ে হয়তো বার বার ভুল পথে গিয়েছি। সহযোদ্ধা ভেবে ভুল মানুষকে নির্বাচন করেছি। সময়ের আবর্তে স্মৃতি ধুলো জমেছে সেখানে। কোনোটা তিক্ত অভিজ্ঞতার ভান্ডার হয়েছে আবার কোনোটা বিস্তৃত হয়েছে। কারো সঙ্গেই তোমার তুলনা চলে না। তুমি নিজেই নিজের তুলনা। তুমি হয়তো সেই মানুষটি যাকে সারাটা জীবন ধরে খুজে বেড়িয়েছি। তুমি কি সেই হিরণ! তুমি যে আমার কতোখানি জুড়ে থাকো, জুড়ে আছো তার কোনো ভাষা নেই। আর যেন আমি ভুল করার কষ্ট না পাই। আমৃত্যু যেন তোমার সংস্পর্শে থাকতে পারি।

লিখতে গিয়ে এখন চোখ ভরে উঠলো বেদনার লোনা জলে। আমার দুঃসহ কষ্টের রোদনগুলো থিতিয়ে আছে বুকের ভেতর শুধু তোমার ভালোবাসার প্রলেপে। তোমার মধ্যে অবিরত একটা চেষ্টা আছে আমার কষ্টগুলোকে ছুয়ে যাওয়ার। তুমি আমাকে খানিকটা বদলে দিয়েছো এটা যেমন সত্য তেমনি কিছু নতুন কষ্ট যোগ করেছো এটাও রূঢ় সত্য। প্রায়ই নিজেকে প্রশ্ন করি, কি চাই, কতোটুকু চাই। তোমারই বা দেয়ার ক্ষমতা কতোটুকু।

কর্তব্যের পাহাড় ডিঙানোর এক কঠিন সংগ্রাম করেছি জীবনের ফেলে আসা দিনগুলোতে যেখানে সফলতার চেয়ে ব্যর্থতা, প্রাপ্তির চেয়ে অপ্রাপ্তির পাল্লা অনেক বেশি ভারী। বিজয়ের বদলে পরাজয়ের বেদনা-গ্লানি, প্রাপ্য সম্মানের বদলে অসম্মান বয়ে বেড়ানো প্রচণ্ড ক্লান্তিকর দুঃসহ একাকী যাপিত জীবনে তুমি যেন আমার আধার রাতের শেষ প্রহরে কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীয়মাণ চাদের আলো। ভেতরটা পূর্ণিমার ভরা জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত। এ আলোর প্লাবনে আমার সকল আধার ভাসিয়ে দিতে পারো না এটাই বাস্তবতা। তবু আমার সকল দুঃখ-বেদনা তোমার নিজের ভেতর ধারণ করার প্রচেষ্টা। তোমার কালিমামুক্ত মনন-চিন্তা, স্বচ্ছ জীবন বোধ আমার ভেতর ছড়িয়ে দিতে চাও। আমি বেচে থাকার প্রেরণা খুজে পাই তোমাতে। এক ছিন্নমূল মানসিক আশ্রয়হীনের এক মাত্র যৌক্তিক ও মানবিক আশ্রয় তুমি। তোমার সহচর্যে এ হতাশাগ্রস্ত আমি অনুপ্রাণিত হই, সুস্থ থাকি। আমার মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার পেছনে তোমার অবদান অসামান্য। তোমার অনাড়ম্বর সুশৃংখল, অতি সাধারণ জীবনাচার তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ শতগুণ বাড়িয়ে দেয়। সদা শান্ত, ধীর-স্থির, সন্তুষ্টচিত্ত, অথচ প্রজ্ঞাময় গতি সম্পন্ন কাজ দেখি আর মুগ্ধ হই এবং তার মাঝে কিছুটা হলেও বিরাজ করি আমি। তোমার এ মহিমান্বিত সংস্পর্শ থেকে আমাকে বঞ্চিত কোরো না কখনো।

নিশ্চয়ই আমি তোমার আরেকজন আপনজন।

ঢাকা থেকে

শিকারি

– আমীর খসরু

বিয়ের দশ বছর পর এ রকম গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হবে জমির তা কখনো কল্পনাও করেনি। একদিন হঠাৎ সে আবিষ্কার করলো তার শারীরিক আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ কমে গেছে। অথচ স্ত্রী সালেহার শরীরের চাহিদা আগের মতোই রয়ে গেছে। অতৃপ্ত সালেহা প্রতি রাতে জমিরের কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করতে থাকে, আপনে ডাক্তার দেখান, চিকিৎসা করান, না হলে আমার জন্য কোনো ব্যবস্থা করেন।

জমির প্রশ্ন করে, কি ব্যবস্থা?

সালেহা উত্তর দেয়, আপনের জিনিস, আপনেই জানেন কি করবেন।

জমিরের মাথা গরম হয়ে যায়। সে ভাবতে থাকে সালেহা আসলে কি বলতে চায়। জমির সিদ্ধান্ত নেয় ডাক্তারের কাছে যাবে। কিন্তু দীর্ঘ দিন ওষুধ খেয়েও তার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয় না। সে গালে হাত দিয়ে ভাবতে থাকে তার দশ বছরের সংসারের কথা, তাদের একমাত্র মেয়ে শিউলির কথা, তার ভবিষ্যতের কথা। যদি সালেহা চলে যায় তাহলে কি হবে? এসব ভাবতে ভাবতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

সে সিদ্ধান্ত নেয়, যেভাবেই হোক সালেহাকে তার সংসারেই রাখতে হবে। কিন্তু কেমন করে সে রাখবে সালেহাকে? মনে মনে উপায় খুজতে থাকে জমির।

জমিরের বাড়ির পাশেই একটা কলেজ। দূর-দূরান্ত থেকে অনেক ছেলে পড়তে আসে। দূরের ছেলেদের জন্য হস্টেল রয়েছে। তবু এদের অনেকে আশপাশের বাড়িতে লজিং থাকে। জমির ঠিক করে, এদের একজনকে তার বাড়িতে রাখবে শিউলির টিচার হিসেবে। কলেজের ছাত্রদের গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে জমির। শুধু লজিং থাকলেই তো চলবে না, সালেহাকেও সুখী করতে হবে। কাকপক্ষীও জানতে পারবে না, শুধু তার সংসারটি টিকলেই হলো।

শিকারি যেমন শিকারের জন্য অপেক্ষা করে ঘন্টার পর ঘন্টা, জমিরও দীর্ঘ দিন পর্যবেক্ষণ করে একজনকে নির্বাচন করে তার শিকার হিসেবে। ছেলেটির নাম সোহেল, দেখতে বোকাসোকা আর তার বাড়িও অনেক দূরে।

একদিন জমির আলাপ করে ছেলেটির সঙ্গে। তার বাড়িতে লজিং থাকার প্রস্তাব দেয়। জমিরকে খুশি করে তার প্রস্তাবে রাজি হয় সোহেল। আনন্দিত জমির ফিরে আসে বাড়িতে। সে ভাবতে থাকে বাকি কাজ কিভাবে সম্পন্ন করা যায়।

সোহেল রাজি হবে তো? কিংবা সালেহা?

ঠিকানা বিহীন
ferrywala13@yahoo.com

সীমার বাধন

অনার্স ফাইনাল দেয়ার পরই বিয়ে হয়ে গেল পরিবারের পছন্দের ছেলের সঙ্গে। শ্বশুরবাড়ির মোটামুটি রক্ষণশীল পরিবেশে এসে মানিয়ে নিতেই কেটে গেল বেশ কয়েকটি মাস। এর মাঝেই অনার্স-এর রেজাল্ট দিল। আমার আশা মতোই ফার্স্ট ক্লাস পেলাম। শ্বশুরবাড়ির সকলেই নতুন বৌয়ের সাফল্যে খুশি। কিন্তু যখন মাস্টার্সে অ্যাডমিশন নিতে চাইলাম, সবাই এক বাক্যে আপত্তি জানালো। স্বামীর খুব একটা আপত্তি না থাকলেও পরিবারের অন্যদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে তিনি রাজি ছিলেন না। তাই পড়াশোনা এবং ক্যারিয়ার গঠনের স্বপ্ন কবর দিয়ে আদর্শ গৃহবধূ হওয়ার চেষ্টায় নামলাম।

আর তখনই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল সে। আমার স্বামীর দিকের আত্মীয়। বড়লোক বাবার একমাত্র সন্তানটি বয়সে আমার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট হলেও বাবার ব্যবসা দেখাশোনা করে বেশ পরিপক্ব হয়ে উঠেছে।

বিয়ের পর থেকেই দেখে এসেছি, এ পরিবারে তার প্রভাব অত্যন্ত বেশি। বয়স কম হলেও পরিবারের যে কোনো অনুষ্ঠানে তার মতামত নেয়া হতো গুরুত্বের সঙ্গে।

প্রথমে ধারণা করেছিলাম, পরিবারের বড় নাতি এবং বিত্তশালী পরিবারের সন্তান হওয়াতেই তার অমন বাড়তি কদর। পরে বুঝেছিলাম এর মূল কারণ ছিল যে কোনো পরিস্থিতি সামলানো এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার

অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তার। যে কোনো কাজকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারতো সে। তার নানা-মামারাও তার পরামর্শ মেনে নিতো বিনা দ্বিধায়।

কিছুটা গম্ভীর প্রকৃতির এ ছেলে আমার সঙ্গে খুব বেশি কথা বলতো না। এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে সবার সামনেই প্রশ্ন করে বসলো, মাস্টার্সে অ্যাডমিশন নিয়েছেন?

হেসে বললাম, না। পড়াশোনা আর করতে ইচ্ছা হচ্ছে না।

অনার্সে এতো ভালো রেজাল্ট করে মাস্টার্স করবেন না কেন? আপনাকে মাস্টার্স করতেই হবে।

এরপর প্রায় নির্দেশের সুরে আমার শ্বশুরকে সে বললো, নানাভাই এ সপ্তাহের মধ্যেই ভর্তির ব্যবস্থা করবেন।

আমি অবাক হয়ে দেখলাম, আমার শ্বশুর যিনি কি না এক সপ্তাহ আগেও আমার পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে জোরালো আপত্তি করেছিলেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে নাতির প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন।

হঠাৎ করেই পাওয়া এ সুযোগে তার প্রতি কৃতজ্ঞতার ভরে গেল আমার মন।

যাওয়ার সময় বলে গেল, খারাপ রেজাল্ট করে আমাকে ডোবাবেন না কিন্তু।

এরপর কেটে গেল সময়। আমি ফার্স্ট ক্লাস নিয়ে মাস্টার্স পাস করলাম। সে উপলক্ষে বাসায় এক পার্টির আয়োজন হলো।

সে এসে বললো, থ্যাংকস আমার সম্মান রাখার জন্য।

ধন্যবাদ তো আমি দেবো, তোমার জন্যই তো আমার মাস্টার্স পাস করা হলো।

সে হেসে বললো, এই তো দিলেন।

জিজ্ঞাসা করলো, এরপর প্ল্যান কি?

কিসের প্ল্যান? অবাক হয়ে জানতে চাইলাম।

এতো কষ্ট করে মাস্টার্স পাস করলেন, কোনো কাজ করার ইচ্ছা নেই?

ক্ষণিক চুপ করে থেকে বললাম, সেটা কি সম্ভব?

সে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, আপনার ইচ্ছাটা কি?

আমার স্বপ্ন ছিল কলেজে পড়ানোর। হালকা গলায় বললাম।

বেশ কিছুক্ষণ পর সে বললো, দেখা যাক কি করা যায়।

তারপর তার একক প্রচেষ্টা আর আমার স্বামীর সমর্থনে পরিবারের অন্য সবার আপত্তি সত্ত্বেও একটা বেসরকারি কলেজে জয়েন করলাম। আমার শ্বশুর মেনে নিলেও শাশুড়ি মেনে নিতে পারলেন না। আমার সঙ্গে খুব শীতল ব্যবহার করতে লাগলেন। সেই সঙ্গে অন্যরাও চাকরি নিয়ে খোটা দিতে লাগলো। যদিও কলেজ থেকে ফিরে ঘরের কাজে হাত লাগাতে কোনোদিন আপত্তি করিনি তবুও অমন ব্যবহারে আমার জেদ চেপে গেল। মুখ বুঝে সব অপমান সহ্য করে চাকরি করতে লাগলাম। সবার সঙ্গে একটা দূরত্ব রচিত হলো আমি না চাইলেও।

এরই মাঝে এলো আমার সন্তান। জীবনটা আরো পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। কিন্তু সব পাওয়ার পরও কি এক অভাব আমাকে তাড়া করে ফিরতে লাগলো। মানসিক চাপে হাপিয়ে উঠতাম। কিন্তু কারো সঙ্গে কথা বলে হালকা হতে পারতাম না।

স্বামী কোনো অভিযোগ শুনতে চাইতো না। বলতো, নতুন অশান্তি তৈরি করো না।

তাই সাহায্য খুজলাম সেই নিঃস্বার্থ সাহায্যকারীটির কাছে।

এবারও সে বিমুখ করলো না।

সে আমার সমস্যা শুনতো, পরামর্শ দিতো। সান্ত্বনা আর সাহস দিতো। তার উন্নত চিন্তা-চেতনা ও বুদ্ধিদীপ্ত সঙ্গ আমার পরম আকাঙ্ক্ষিত হয়ে উঠলো।

এভাবেই একদিন আবিষ্কার করলাম তার প্রতি ভালোবাসায় ভরে গেছে আমার মন। তার চোখেও একই ভাষা পড়তে কষ্ট হয়নি আমার। কিন্তু এ অসঙ্গত ভালোবাসার উপস্থিতিতে নিজেকে ভীষণ ছোট মনে হলো। চেষ্টা করতে লাগলাম নিজেকে সামলানোর।

এরপর এলো আমাকে এলোমেলো করে দেয়া সেই সন্ধ্যা।

এক অনুষ্ঠান শেষে শ্বশুরের গ্রামের বাড়ি থেকে তার সঙ্গে শহরে ফিরছিলাম বেবিট্যাকসি করে।

কিছুটা পথ আসতেই নামলো তুমুল বৃষ্টি। সেই সঙ্গে ঝড়ো বাতাস।

বৃষ্টির ছাট ঢুকতে থাকায় ট্যাকসির ভেতর দিকে চেপে বসলাম।

সে তখনো এক পাশ ঘেষে বসা।

ভেতরে সরে আসতে বলায় প্রথমে এলো না। আবার বলাতে এলো।

দুজনে গা ঘেষাঘেষি করে ট্যাকসিতে বসে আছি। অন্ধকার পথ ধরে ট্যাকসি ছুটে চলেছে। সব কিছুতে হিম শীতল একটা ভাব।

আমার কি যে হলো, আমি তার একটা হাত নিজের মুঠোয় ধরলাম। কিছুক্ষণ ওভাবে বসে থাকার পর সে ঝুকে পড়ে আমার ঠোটে চুমু খেল।

আমার সমস্ত শরীরে কি এক শিহরণ ছড়িয়ে গেল!

মনে হলো এমন আবেগি স্পর্শ জীবনে কখনো পাইনি।

যখন চাইছিলাম সে স্পর্শ যেন আরো নিবিড় হয় তখন সংবিৎ ফিরে এলো। মনে ভেসে উঠলো সন্তানের মুখটি। অস্ফুট স্বরে বললাম, না।

সেও থমকে গেল।

হাত ছাড়িয়ে নিতে চাইলো।

কিন্তু ছাড়লাম না।

হাত ধরে নিশ্চুপ বসে রইলাম দুজনে।

ঘরে পৌছার পর ট্যাকসি থেকে নামার সময় সেই হাত ছাড়লাম।

এরপর বেশ কিছু দিন সে আমাদের বাসায় এলো না।

একদিন এলো। অনেকক্ষণ দুজনে কোনো কথা না বলে মুখোমুখি বসে রইলাম।

হঠাৎ করে বললো, কেন এমন হলো? কেন আপনাকেই ভালোবাসলাম?

এর জবাব আমার কাছে ছিল না। তাই বললাম, যা হওয়ার নয় তা নিয়ে ভেবে মিছে মিছে কষ্ট করো না। তোমার সামনে অনেকটা পথ রয়ে গেছে।

সে ম্লান হেসে বললো, হ্যা, অর্থহীন পথ চলা।

এরপর থেকেই আমরা দুজনই দুজনকে এড়িয়ে চলি। দুজন শিক্ষিত, রুচিশীল মানুষের পক্ষে কোনো অসঙ্গত সম্পর্ক গড়ে তোলা সহজ নয়, উচিতও নয়।

আমরা দুজনই নিজেদের সীমানা চিনতাম। এক মুহূর্তের জন্য আমরা সেই সীমানায় দাড়িয়ে চাইছিলাম, অন্যজন সেই সীমার বাধন ভেঙে ফেলুক।

কিন্তু তা আমরা করিনি। যদিও জানি তার সামান্য আহ্বানে আমি নিজেকে সামলাতে পারতাম না। ঠিক সময়ে তার আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য অনেক বড় অন্যায় থেকে বেচেছিলাম। এ জন্য তার প্রতি শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু মাঝে মধ্যে মনে হয়, সে আমার সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করে বুঝি আমার নারীত্বকেই অপমান করেছিল।

অন্যদিকে আমার ভালো মানুষ স্বামীটিকে সত্যিকার ভালোবাসা দিতে পারিনি বলে নিজেকে অপরাধী মনে হয়।

আমার সব ভালোবাসাই যে আরেকজনের জন্য জমা রয়ে গেল। যা কখনোই তাকে দেয়া হবে না। ভালোবাসার দিনেও তাকে কিছুই দেয়া হবে না।

শুধু আকাশ পানে তাকিয়ে বলবো, ভালোবাসি। সীমাহীন আকাশ হয়তো সে বার্তা পৌছে দেবে সীমাবদ্ধ ভালোবাসার মানুষটির কাছে কোনো একদিন।

নাম ঠিকানা বিহীন

ভয়ংকর শূন্যতা

– দীপ্তি

পচিশ বছর ছয় মাস বয়স পার হবার পর নিজের মধ্যে ভাঙনের শব্দ শুনি। চমকে উঠি। হৃদপিণ্ড তো অনেক আগেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। স্নায়ুও বিদায় দিয়েছে অনুভূতিকে। চোখে উঠেছে মাইনাস পাওয়ারের চশমা। এখন আর পুরো পৃথিবীকে দুই চোখ ভরে দেখতে পাই না। চার চোখের মিলনে একটা জগাখিচুড়ি তৈরি হয়েছে। চোখের সামনে একটা ফ্রেম সব সময় অনুভূতিকে পীড়া দেয়। উপরে কিছু দেখতে গেলে লেন্সের ফোকাস পাওয়া কঠিন হয়। চোখ আকৃতিতে ছোট বিধায় পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখার সুখ পাই না। তবুও চশমা চোখে ওঠার আগে দুই চোখ ভরে দুটো পদ্ম ফোটা চোখ দেখার সাধ অপূর্ণ থেকে গেল।

এখন নিজেকে কেমন নিঃস্ব মনে হয়। কেউ নেই, কিছু নেই। কিছু চাওয়ার নেই, কোনো পাওয়ার আশা নেই। ধুধু মরুপ্রান্তর চারদিকে। শুধুই শূন্যতা আর মৃত্যুর গন্ধ বাতাসে। সম্পর্কগুলো কেমন ফ্যাকাশে রঙ ধারণ করেছে। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, নিরাপদ ভেবে আসা আশ্রয়গুলো কেমন ঠুনকো, কেমন ভয়ংকর। অগ্রজার অহংকারে গর্বিতা আমি কেমন কুকড়ে যাই অপমানের হাত থেকে নিজেকে বাচাতে।

দুই মুঠো ভাত, মাথার উপর ছাদ, আর নিজের নিরাপত্তা নিজে অর্জন করতে না পারার ব্যর্থতায় হু হু করে কাদি। সারা জীবন ধরে অর্জন করেছি অপমান লাঞ্ছনা। তবু মরুভূমিতেও যেমন মরুদ্যান আছে তেমনি আমার অপমানের জীবনেও আছে কিছু সুখের অভিজ্ঞতা।

আমার জীবনের অন্ধকার ছায়াপথে উল্কার মতো কিছু মানুষের দেখা পেয়েছি। যারা আমার চলার পথে ছড়িয়ে দিয়েছে কিছু প্রাণের পরশ। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, বীর উত্তম শহীদ তোরণের নিচে দাড়ানো নাম না জানা সুদর্শন, ঋজু, দৃঢ় পায়ে দাড়ানো লম্বা, শিক্ষিত, মার্জিত রুচির সেনাবাহিনীর সদস্যের যার আশ্চর্য ভালো ব্যবহার অবাক চোখে দেখেছি। পাটগ্রাম সীমান্তের ওষুধ ব্যবসায়ী যুবক, বন্ধু হিসেবে সে অসাধারণ। এতো সহজ, সরল, বুদ্ধিমান এবং ভালো ব্যবহার তার যে আমি মুগ্ধ।

দিনাজপুরের বাসিন্দা অনুজপ্রতিম সরল, দুঃখী এক সদ্য তরুণ যে অকস্মাৎ আমাকে আমার বিস্মৃত অতীতের ফেলে আসা কাশবনে নিয়ে গিয়ে আমার মাথায় ছড়িয়ে দিয়েছে মুঠো মুঠো শিউলি ফুল। সেই শিউলির সুবাসে আমি বাকরুদ্ধ, স্তম্ভিত। সেলুলয়েডে চলে আসে একটি হাসিমাখা মুখ যার দুই চোখ যেন দুটি পদ্ম।

এবং রংপুর মেডিকাল কলেজের আটাশতম ব্যাচের হোস্টেল নিবাসী ঢাকার বাসিন্দা নাফিসা। সে আমাকে দেড় কাপ চা, দুটো পরাটা আর আলু, পেপের তরকারি খাইয়েছিল। এবং করেছিল ভালো ব্যবহার। এই মেয়েটাকে কেনো যেন আমার ভালো লাগে। আসলে ভালো ব্যবহার জীবনে খুব কম পেয়েছি। তাই ভালো ব্যবহারের প্রতি আমি সংবেদনশীল।

আমি দেখেছি দুর্বলতা পেয়ে মানুষ কিভাবে একতরফাভাবে বিনা উস্কানিতে মানুষের কতো বড় ক্ষতি করতে পারে। দেখেছি মানুষের ভয়ংকর নোংরা চেহারা। কি বীভৎস, কুৎসিত মানুষ হতে পারে নিজে চোখে দেখেও বিশ্বাস হয় না। ভালো ব্যবহারের প্রতিদানে কি করে মানুষ ছুড়তে পারে গাদা গাদা কাদা।

জীবনের অসহ্য বৈরিতায় যখন ভীষণ ক্লান্ত তখন জীবন পাত্রের শেষ তলানিটুকুতে নিজের চাওয়া–পাওয়াকে বাচিয়ে রাখতে নেমেছিলাম কালো পিচ ঢালা পথে। সেই রাজপথ ধরে বহুদূর হেটেছি। দেখেছি মানুষের নির্মম চেহারা। ফিরে এসেছি পুরনো ঠিকানায়। আমার প্যানপ্যানে কথাবার্তায় আমার যে গুটিকয়েক বন্ধু আছে

তারা বিরক্ত। ফলে আজ আমি বন্ধুহীন, পথহীন, অল্প শিক্ষিত, বেকার এক ভাগ্যহত নারী যে নিজ গৃহে পরবাসী। আমার এ দুর্বলচিত্ত হৃদয়ে এতোদিন একটা প্রাণ প্রদীপ ছিল যে আমাকে বাচিয়ে রেখেছিল, পৃথিবীর আলো বাতাসে সৌন্দর্য যুগিয়েছিল, কালের পরিবর্তনে সে প্রদীপ আজ নিভে যাওয়ার পথে। প্রাণ ছাড়া মানুষ বাচে কি করে? সবার মতো আমাকেও হয়তো বাচতে হবে তেল ছাড়া প্রদীপের মতো। ভাবতেই আমার দম বন্ধ হয়ে আসে!

আজ আমি সবার কাছে অপাংক্তেয়, অবাঞ্ছিত। কোনোদিন বাঞ্ছিত ছিলামও না। এইচএসসি পাস সার্টিফিকেট আমার নামের অর্থকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে জীবনটা পুরো অন্ধকারে ঢেকে দিয়েছে।

আমি এক অপয়া নারী যেন যার জীবনের চারদিকে শুধুই শূন্যতা। আমার ভালোবাসা আজ নির্বাসিত। নিজের চারদিকে বেদনার লাল নীল কষ্টগুলোকে সাজিয়ে বসে আছি এক খোলা প্রান্তরে যার শেষ জানি না। শুধু জানি অন্ধকার, শূন্যতা আর অপমানের এক জীবন আমি বয়ে চলেছি যেখানে আমি একা, ভীষণ একা, ভয়ংকরভাবে একা।

রংপুর থেকে

মিথ্যা কলের বন্ধু

- রাহুল ব্যানার্জী সুমন

আমি মোবাইল ব্যবহার করি বছর তিনেক মাত্র। প্রথম থেকেই কঠোর নীতি অবলম্বন করি, কাউকে মিসকল দিই না। কারো মিসকল এটেন্ড করি না। মিসকলে আমি খুব বিরক্ত হই, সব বন্ধুরা সে বিষয়ে ধাতস্ত। তারপরেও প্রতিদিন একাধিক মিসকল আসে। জরুরি মনে না হলে কল ব্যাক করি না।

৩ ডিসেম্বর ২০০৩-এ ঢাকায় বিভাগীয় পরীক্ষা দিতে এসে এক বন্ধুর বাসায় বন্ধুকে না পেয়ে তার মিসেসের অনুরোধে চা খেতে অপেক্ষা করছি। গল্প করছি, দুই একটা আঙুর মুখে দিচ্ছি। এমন সময় একটা মিসকল এলো।

বন্ধুপত্নী বললেন, আপনিও একটা দিয়ে দিন।

যে কথা সেই কাজ। মুহূর্তের মধ্যে কল ব্যাক এলো।

নারী কণ্ঠ, কি ব্যাপার মিসকল দিলেন কেন?

মিসকল পেলাম, তাই দিলাম।

নাম, পেশা, কোথা থেকে কথা বলছি জানতে চাইলেন।

যথাযথ বললাম। কৌতূহল বশে অনামিকা নামের নাম্বারটি এন্ট্রি করলাম। দেখলাম গেল দশ দিনে প্রায় প্রতিদিন দুই চারবার করে মিসকল আসে। সন্দেহ করলাম পুরনো এক আইনজীবী বন্ধুকে। মেসেজ পাঠালাম।

জবাবে ফোনে জানালেন, সন্দেহ সঠিক নয়।

প্রশ্ন করলাম, আপনার নিবাস কোথায়?

জানালেন, নদীর পাড়ে কোনো এক জেলায়।

বললাম, বুড়িগঙ্গার তীরে ঢাকা, শীতলক্ষ্মার তীরে নারায়ণগঞ্জ, কীর্তনখোলার তীরে বরিশাল, রূপসার তীরে খুলনা, কপোতাক্ষ তীরে যশোর, ব্রহ্মপুত্র তীরে ময়মনসিংহ, ধানসিড়ি তীরে ঝালকাঠি, সুরমা তীরে সিলেট, তিতাসের তীরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গোমতির তীরে কুমিল্লা। কোন নদীর পাড়ে, কোন জেলায় আপনার নিবাস?

বললেন, হবে একটা নিশ্চয়ই।

জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় বসে কথা বলছেন?

উত্তর, গাছের নিচে বসে।

কোথায়?

ধানমন্ডি।

কি করা হয়?

পড়াশোনা।

কোথায়?

ইডেনে।

তারপর প্রায় প্রতিদিনই কম বেশি কথা হয়, দশ বিশ পচিশ মিনিট করে। ব্যক্তিগত খোজখবর নেয়া প্রভৃতি।

২ জানুয়ারি ২০০৪-এ শুক্রবার একাকী ঘরে শুয়ে টিভি দেখছিলাম। মনটা খুব খারাপ ছিল। ভাবলাম একটু কথা বলে দেখি। কথা হলো দুজনার প্রায় পচিশ মিনিট।

সেদিনই তার নাম জানালেন, নিরূপমা রায় চৌধুরী ঝরনা, নিবাস সুরমা তীরে সুনামগঞ্জ।

মনে মনে ভীষণ খুশি হলাম। প্রকাশ করলাম না। বিকেলে আবার ফোন পেলাম।

এক পর্যায়ে প্রস্তাব দিল, আমরা তো বেশ কয়েকদিন ধরে কথা বলছি। আপনি আপনি সম্বোধন করছি।

তুমি করে বললে কেমন হয়?

বললাম, উভয় পক্ষ থেকে একই সম্বোধন হলে আপত্তি নেই।

তুমি সম্বোধন শুরু করে দিলাম সঙ্গে সঙ্গেই।

সে ওই সময়ে তার বাস্তব সমস্যার কারণে তুমি বলতে পারলো না। পরের দিন থেকে তুমি সম্বোধন শুরু করলো।

এরপর আমরা দিনে দিনে কখন যে একান্ত আপন হতে লাগলাম কেউ-ই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ছাত্র জীবনে অনেক মেয়ে আমার প্রতি আগ্রহী ছিল। আমিও দুই চার জনের প্রতি আগ্রহী ছিলাম না তা নয়। কিন্তু ছাত্র রাজনীতির প্রতি একাগ্রতার কারণে প্রেমে জড়াতে ভীষণ ভয় হতো। তাই অসংখ্য মেয়ে বন্ধু থাকা সত্ত্বেও প্রেম করা বা প্রেমের স্বাদ নেয়া সম্ভব হয়নি। আমার প্রতিটি বিষয় ভিত্তিক খাতায় বড় হরফে লেখা থাকতো Don't try to touch my soul. I am busy with me and my duty.

কোনো এক সময় তারও জানা হলো আমরা পরস্পর প্রায় চারশ কিলোমিটার দূরে থাকি। প্রথম দিন ফোনে কথা বলার সময় আমি ঢাকায় ছিলাম। তার ধারণা ছিল আমি ঢাকাতেই থাকি। বাস্তবে সে ঢাকায় আর আমি সুনামগঞ্জে। কেমন কাকতালীয়ভাবে আমরা একই জেলা শহরের বাসিন্দা। সে বেশ কয়েকবার বাড়ি বেড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিল। নিষ্ঠুর বাস্তবতার কারণে ব্যর্থ হলো।

ইতিমধ্যে আমরা পাগল হয়ে উঠলাম পরস্পরকে চেনার বা দেখার জন্যে। অবেশেষে দিনক্ষণ ঠিক হলো ১৬ জানুয়ারি ২০০৪-এ শুক্রবার বিকাল তিনটায় এক বন্ধুর বাসায় মধুর মিলন হবে। বৃহস্পতিবার রাতে বাসে উঠলাম। যতোক্ষণ সজাগ ছিল দশ পনেরো ত্রিশ মিনিট পর পর আমার অবস্থানের খোজ নিতো। ভোরে এসে তার আবাস চিনলাম। অতিথি ছিল বলে সকালে আমাদের দেখা সম্ভব হলো না।

প্রথম দর্শনে বা মিলনে আমাদের মধ্যে কোনো সঙ্কোচ, সংশয় কাজ করলো না। কারণ এর আগে কয়েকশ ঘন্টা কথা বলেছি মোবাইলে। অনুভূতই হয়নি প্রথম দর্শন। মনে হয়েছে পরস্পর যুগ যুগ ধরে চেনা। আমরা যেন কতো কাছের মানুষ, আপন মানুষ।

তার প্রথম প্রশ্ন, নিশ্চয়ই যেমনটি আশা করেছো তেমনটি আমি নই। পছন্দ করার মতো কিছুই নেই আমার।

আমি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছি এভাবে - আমরা কথায়, ভাব বিনিময়ে, ভাষায়, অভিব্যক্তিতে এমন স্তরে পৌছে গেছি যে, এখন আর কারো পেছন ফেরার পথ নেই। নিঃসঙ্কোচে আমরা পরস্পর পরস্পরের হাতে হাত রেখে, যেন বিধাতার নির্দেশিত প্রাকৃতিক নিয়মে আমরা লীন হয়ে গেলাম। ঝরনা ধারা যেমন পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, নদী-খাল অতিক্রম করে দুকূল ভাসিয়ে সাগরে মিলে তৃপ্ত হয় তেমনি তার প্রতিক্রিয়া ছিল, মরুভূমিতে

বহুকাল পরে হঠাৎ যদি বৃষ্টি ধারা ঝরে অঝোরে। মরুভূমি কি তাতে অখুশি কিংবা অসন্তুষ্ট হয়, না হতে পারে?

তারপর নিয়মিত চারশ কিলোমিটার অতিক্রম করে মাসে দুই তিনবার দেখা হতে লাগলো। যতোই দেখা হতে লাগলো, পরস্পরের আকর্ষণ আরো তীব্র হতে লাগলো। আমরা ঘুরে বেড়াই বিভিন্ন শপিং মলে, বিভিন্ন হোটেল-রেস্তোরায় আড্ডা দিই সব বাধা ভুলে।

অথচ সে দেখা হবার আগে থেকেই বলছিল, আমি দেখতে সুন্দর নই, মোটা, খাটো। আমাকে দেখলেই তুমি হতাশ হবে, পিছিয়ে যাবে, পালিয়ে যাবে। আমার প্রতি এই না দেখা আকর্ষণ মুহূর্তেই কর্পূরের মতো উবে যাবে আরো কতো কি! তারপর যখন দেখলো আকর্ষণ হারাইনি, বরং দিন দিন আরো বেড়েই চলে, তখন বলতো, তোমার এ পাগলামি সর্বোচ্চ তিন মাস স্থায়ী থাকতে পারে। তিন মাস অতিক্রম করার পরে বলতো, ছয় মাসের আগে অবশ্যই নিঃশেষ হয়ে যাবে তোমার এ পাগলামি (আকর্ষণ)।

এখন এক বছর অতিক্রম করে আমাদের শুভ মিলনের বর্ষপূর্তি এবং এই স্বল্প বা দীর্ঘ সময় যাই হোক, এই সময়ে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৪-এ ভালোবাসা দিবস, আমাদের পরস্পরের জন্মদিন, জাতীয় ও ধর্মীয় বিভিন্ন দিবসে আমরা পরস্পর একত্র হয়েছি। ঘুরে বেড়িয়েছি নিত্যনতুন শপিং মলে। নতুন নতুন হোটেল-রেস্তোরায় আড্ডা দিয়েছি অতীত-ভবিষ্যৎ ভুলে, কেবল বর্তমান নিয়ে। কতো বাধা-বিপত্তি, চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে, কতো দুর্যোগ-দুর্ঘটনা অতিক্রম করে আমাদের বন্ধুত্ব আজো অম্লান, আজো পূতপবিত্র। এ জনমে আমাদের মিলন কোনোদিন সম্ভব হবে না হয়তো। তবুও আমরা স্বপ্ন দেখি, মনে-প্রাণে শপথ করি, আমাদের এই পবিত্র বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী থাকবে আমরণ, জন্ম জন্মান্তর।

৯ নভেম্বর ২০০৪-এ মঙ্গলবার আমার আকর্ষণের তীব্রতার এক কঠিন পরীক্ষা নিল সে। পরীক্ষায় সে চার ভাগের এক ভাগ (২৫%) নাম্বারও পেল না। তারপরও তার প্রতিনিয়ত সংশয়, সন্দেহ, অবিশ্বাস তাকে কুরে কুরে খায়।

তাকে বললাম, একটি মাত্র পরীক্ষা বাকি আছে। তা হচ্ছে, এক বোতল বিষ তোমার সামনে খেয়ে তোমার কোলে মাথা রেখে মৃত্যুকে বরণ করা। যদি তুমি দেখতে চাও, সে পরীক্ষা দিতেও আমি প্রস্তুত।

আমরা উভয়েই প্রথম থেকে বলে এসেছি এবং বিশ্বাস করি, আমাদের এ যোগাযোগ বা সম্পর্ক আধ্যাত্মিক, ঐশ্বরিক তথা বিধাতার লীলা। লাইলী-মজনু, শিরি-ফরহাদ, ইউসুফ-জুলেখা, রাধা-কৃষ্ণ সম্পর্কের চেয়ে আমাদের সম্পর্ক ছোট বা খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। এ জনমে সম্ভব না হলেও আমাদের মিলন হবে পরজনমে যেখানে মর্ত্যের কোনো মানুষের, কোনো সমাজের, কোনো নিয়মের, কোনো বাধাই আমাদের হটাতে পারবে না। আমাদের ভালোবাসাকে ম্লান করতে পারবে না। তারপরও তার দোলাচল মনে স্বস্তি সে খুজে পায় না। এই বুঝি তাকে ছেড়ে গেলাম।

তার যে চলে যাওয়া, ছেড়ে যাওয়া কিংবা সম্পর্ক ছিন্ন করার সম্ভবনা ও সুযোগ আমার চেয়ে হাজার লক্ষ কোটিগুণ বেশি, সে কথা সে মানতেই চায় না। তাই তো তাকে বলি, তুমি এক জনমে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও আমাদের মিলন হবে পর জনমে। তা তুমি ঠেকাতে পারবে না। আমার ভালোবাসা নিখাদ, কোনো কলঙ্ক নেই, নিষ্পাপ। আমার ভালোবাসা *নিকষিত হেম, পাপ গন্ধ নাহি তায়।*

হাসান নগর, সুনামগঞ্জ থেকে

বাজান

- এম ভূইয়া

তখনো নাবিল কথা বলা শেখেনি। একদিন সকালে সে কাকু বললে তখনি তার গালিবভাইয়া আনন্দে আত্মহারা যে, তার ছোট্ট ভাইয়া কথা বলতে শুরু করেছে। ওই দিন সে সবার কাছে বলে বেরিয়েছে ওই একই কথা।

কিন্তু নাবিল আর আমার মধ্যে সম্বোধনটা ওই পর্যন্ত থাকেনি। তা হলো *বাজান*। আমি ওকে বাজান বলতাম এবং নাবিলও আমাকে বাজান ডাকতো। সিংগাপুর থাকা অবস্থায় আমার বাবা চলে যান পরপারে।

সিংগাপুর থেকে আসার কিছু দিন পরে নাবিলের জন্ম হয়। যখন তখন ওকে কোলে নিতাম, ঘুমের মধ্যে ওকে চুমু খেতাম, বাইরে থেকে এসে ওর পাশে শুতাম কিংবা ওকে আমার বুকে নিয়ে শুতাম। এভাবে বেশি দিন আমাকে যেতে হয়নি। নাবিল যখন হাটা শিখলো, বেশির ভাগ সময় আমার সঙ্গে থাকতো। খুব বেশি ভালো লাগলো, সকালবেলায় দৌড়ে আসতো আমার রুমে *বাজান ওঠো*। কোনো কোনো সময় তার প্যান্ট পরারও সময় থাকতো না। তার বয়স তখনো দুই বছর হয়নি। ওর ওই মধুর ডাকে ঘুম ভাঙতো, একটু দেরি করলে সে মশারির ভেতর চলে আসতো। কখনো আগে ঘুম ভাঙলেও শুয়েই থাকতাম ওর আসায় কখন নাবিল আসবে? ওর সঙ্গে আমার হাজারো স্মৃতি আছে।

একদিন আমার বাম পায়ের বুড়ো আঙুলের নখে সমস্যা হওয়াতে একজন মেডিকাল অ্যাসিস্ট্যান্ট আমাদের বাসায় আসে নখটা তুলতে। কমলবাবু যখন অবশ করে নখটা তুলছিল তখন একটু ব্যথা পেলে অমনি সে কমলবাবুকে বলে, *ওই তুই ব্যথা দিবি না আমার বাজানকে*। সে আমার পা–টাকে চাপা দিয়ে ধরে রেখেছিল এবং মাঝে মাঝে আমার চোখের ওপর হাত দিয়ে বলতো *বাজান তুমি দেখো না*।

আজও ভাবতে অবাক লাগে ওই দিনের মাত্র দুই বছরের বালকের মাঝে যে পরিমাণ মায়া–মমতা এবং দায়িত্ব দেখেছি তা সত্যি প্রকৃতির দান। তার ওই দিনের ঘটনাকে একটু বিশ্লেষণ করলে যা হয় তা হলো এই–

এক. আমার নখের একটা সুচিকিৎসা হওয়া দরকার এবং চিকিৎসকের যাতে কোনো সমস্যা না হয় এর জন্য আমার পা–টাকে তার কোমল হাতে শক্ত করে ধরা যা ছিল তার দায়িত্ব।

দুই. ব্যথায় যখন কষ্ট পাচ্ছিলাম তখন চিকিৎসককে হুশিয়ার করে দেয়া যা ছিল তার মমতা।

তিন. আমার চোখের ওপর তার ছোট্ট হাতখানি রেখে পায়ের নখটাকে আড়াল করা যা ছিল আমার প্রতি তার গভীর সান্ত্বনা এবং সমবেদনা।

ওই সময় তার চেহারাটা ছিল একজন সাহসী পুরুষের মতো, যার মাথায় ছিল যুদ্ধ জয়ের মতো কঠিন দায়িত্ব। তাই সে একটুও ভয় পায়নি, বরং তার দায়িত্বে সে ছিল অটল। অপারেশন শেষে সে আমার পায়ের নখটিতে ফু দিয়েছে বাতাস করেছে। মজার ব্যাপার হলো, সে আর কখনোই কমলবাবুকে পছন্দ করতো না।

বাজান, তোমাকে অসংখ্য ধ্যনবাদ তোমার অকৃতিম, পবিত্র, সুন্দর ভালোবাসার জন্য। তোমাকে আমি ভালোবাসি ঠিক আগের মতোই। হয়তো তুমি কিছুটা ভুলে গিয়েছো সেটা আমারই জন্যে। কারণ আমাদের সেই সুন্দর দিনগুলোকে বিসর্জন দিয়ে আমি ফ্রান্সে চলে আসি। আর তুমি তখন বলছিলে, *বাজান আমাকে ছেড়ে যেও না*। কিন্তু আমি পারিনি, পারে না আমার মতো অনেক হতভাগারা।

Bazan, I am really sorry for that and I always love you.

ফ্রান্স থেকে

nabilbazan@hotmail.com

কোলাকুলি

- মহাব্বত

কোলাকুলি আমাদের সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায়। সাধারণত আমরা ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আজহার নামাজের পর এক ভাই অন্য ভাইয়ের সঙ্গে কোলাকুলি করে থাকি। বহুদিন পর কারো সঙ্গে দেখা হলে, সে ক্ষেত্রেও করে থাকি। কিন্তু আমার কোলাকুলিটা একটু ভিন্ন।

আমার ভিন্ন প্রকৃতির কোলাকুলি বুয়ার সঙ্গে। সাধারণত বুয়া অর্থ কাজের মেয়ে। কিন্তু এই বুয়া সেই বুয়া নয়। এই বুয়া আমার মনের মানুষ, আমার পছন্দের মানুষ।

বুয়ার সঙ্গে অভিমান করে তাদের বাড়িতে যাওয়া-আসা বন্ধ। কিন্তু ঈদের দিন সব অভিমান ভুলে তাদের বাড়িতে যাই। প্রথমেই তার সঙ্গে দেখা।

সে ঈদের শুভেচ্ছা জানায়।

আমি চুপ।

হঠাৎ সে বলে উঠলো, আমি কি বর দেখছি?

তার এই কথা শুনে হেসে বললাম, ঈদ মোবারক, কেমন আছো বুয়া?

সে বললো, ঈদের সালামি কোথায়।

বললাম, সালামি দেবো ঠিকই কিন্তু কোলাকুলি করতে হবে।

সে রাজি হয় কোলাকুলি করতে।

অবশেষে দুজনে বারান্দায় দাড়িয়ে কোলাকুলি করি। তাই কাউকে কোলাকুলি করতে দেখলে সেই স্মৃতি মনে পড়ে যায়।

উত্তরা, ঢাকা থেকে

ভারমুক্ত

- জিয়া

সকালবেলা ঘুম থেকে ডেকে তুলে বাজারের ফর্দ ও টাকা দিয়ে তাড়াতাড়ি পৌছে দিতে বলেই চলে গেলেন বুড়িআপা। পুনরায় ঘরে ফিরে বাসার ঠিকানা দিয়ে গেলেন।

বুড়িআপারা আগে থাকতেন আমাদের পাশের বাসায়। তখন থেকেই পরিচয়। বয়সে আমার চেয়ে তিন চার বছরের বড়। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই আমাদের সম্পর্ক বন্ধুর মতো। অবাধ মেলামেশা, হাতাহাতি লেগেই থাকতো। এতে আমাদের দুই পরিবারের কেউ কিছু মনে করতো না। মাঝে কয়েক বছর আমি বিদেশে অবস্থান করায় এবং বাসা বিক্রি করে বুড়িআপারা চলে যাওয়ায় যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

বাজার করে নিয়ে বাসায় গিয়ে দেখলাম বুড়িআপা একা।

তিনি অভিমানের স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি দেশে এসেছো প্রায় দুই সপ্তাহ অথচ একবারের জন্যও আমাকে দেখতে এলে না কেন?

বললাম, একে তো অনেক বছর পর দেশে এলাম, তাই ব্যস্ত, তার উপর আপনার বাসা চিনতাম না।

কৈফিয়ত পর্ব শেষে তাকে বাসার অন্য লোক কোথায় জানতে চাইলে তিনি বললেন, সে অনেক কথা। এতো কথা শোনার মতো ধৈর্য কি তোমার আছে?

উত্তর দিলাম, আপনি বললে আজ সারা দিন এখানেই থাকবো। এক পাও বাইরে যাবো না।

বুড়িআপা হেসে উত্তর দিলেন, এতো বছরে তুমি এতোটুকুও বদলাওনি। কি খাবে বলো?

উত্তর দিলাম, আপনি যা খাওয়াবেন তা-ই খাবো।

তিনি পাশের রুমে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর এসে দাড়ালেন সেমাই ও চা হাতে। বললেন, আপাতত সেমাই, চা খাও, পরে অন্য কিছু খাবে।

নাশতা পর্ব শেষে জানতে চাইলাম একা থাকার রহস্য।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসে থেকে তিনি তার জীবনের যে দুঃখভরা কাহিনী শোনালেন তা নিম্নরূপ :

তোমাদের পাশের বাসায় থাকার সময় আমিন মানে তোমার দুলাভাইয়ের পক্ষ থেকে প্রেমের প্রস্তাব পেলাম। কোনো কিছুই না ভেবে তার প্রেমে সাড়া দিয়ে যে ভুল করেছি সেই ভুলের জন্য আজ এই অবস্থা। এক মাসের মধ্যেই তাকে পালিয়ে বিয়ে করতে বাধ্য হলাম। আমার পরিবারের সদস্যরা আমিনের সঙ্গে মিশতে না করেছিল। রাগে, দুঃখে আমার আব্বা বাসা বিক্রি করে অন্য সকলকে নিয়ে গ্রামে চলে যান। আমিনকে বিয়ের পর কিছু সত্যের মুখোমুখি হলাম। আমিন আমার এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর প্রেমের প্রস্তাবে সাড়া না পেয়ে আমাকে প্রেমের প্রলোভনে ফেলে বিয়ে করে।

দ্বিতীয়ত. আমিন নেশায় আসক্ত এবং মাঝে মধ্যে সে নিষিদ্ধ পল্লিতেও যাতায়াত করে। এক সময় সে এই শহরের নেশা আমদানির মূল এজেন্ট ছিল। সে জন্য পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে যায়। জন্মের পর পরই বাবাকে হারায় এবং বিশ বছর বয়সে মাকে হারানো নিঃসঙ্গ আমিন আমার স্বামী। অন্য কোনো আত্মীয় না থাকায় আমাকেই দৌড়াদৌড়ি করে আমিনকে জামিনে আনতে হয়। দুইবার তাকে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করেছি। নেশার টাকার জন্য সে এই শহরের দুটি বাসা বিক্রি করেছে। তাকে কতো বুঝিয়েছি, কতো নিষেধ করেছি তার ইয়ত্তা নেই। সর্বশেষ সম্বল এই বাসার অর্ধেক অংশ ভাড়া দিয়ে রেখেছি বুদ্ধি করে।

তাকে বোঝাতে গিয়ে শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়েছি অনেকবার। এখনও শরীরে নির্যাতনের চিহ্ন রয়েছে। দেখো, বলেই তিনি দাড়িয়ে শাড়ির উর্ধ্বাংশ ফেলে দিলেন।

ব্লাউজের ওপর দিয়ে জোড়া পর্বত এবং তার নিচে নির্যাতনের কিছু চিহ্ন দেখতে পেলাম। লজ্জায়, ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

তিনি আবার বলতে লাগলেন। কয়েকদিন আগে এক রাতে এক মেয়েসহ এসে হাজির হয় এবং আমাকে রাতের জন্য অন্যত্র যেতে বলে। রাজি না হওয়ায় পাগলামি আরম্ভ করলে কিছু লোকজন ধরে পুলিশে সোপর্দ করে। তাকে এখনো প্রচণ্ড ভালোবাসি এবং আমার যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। তাই তাকে ছেড়ে যেতে পারছি না। আবার আমার জীবনকেও ভালোবাসি। ফলে হাজারো কষ্ট সত্ত্বেও আত্মহত্যার কথা চিন্তা করি না।

আপনার মনে এতো কষ্ট তা বুঝতে পারিনি। আপনার দুঃখে আমিও দুঃখিত।

তুমি তো দেশেই থাকতে না। দুই দিন আগে তোমার বন্ধু শহিদের মুখে শুনতে পেলাম তুমি দেশে এসেছো। এরপর চিন্তা করলাম তুমি তো আমার বন্ধু, তোমাকে আমার দুঃখের কথা বলে আমার বুকটা একটু হালকা করি। আজ যখন একটি দুঃখের কথা বলেছি, তাহলে আরেকটি দুঃখের কথা জানাই। আমার দিকে ভালোভাবে তাকিয়ে সত্যি করে বলো, আমি কি বৃদ্ধা হয়ে গেছি? আমার মধ্যে কি কোনো আকর্ষণ নেই?

উত্তর দিলাম, আপনার এখনো যে চেহারা আছে তাতে অনেক যুবকের মাথা ঘুরে যাবে।

তাহলে আমিনের কেন মাথা ঘোরে না? কি নেই আমার মাঝে? বিয়ের পর থেকেই দেখে এসেছি তার নেশায় আগ্রহ, দৈহিক মিলনে কোনো আগ্রহ নেই। আমার যে দৈহিক মিলন প্রয়োজন তা সে কোনোদিন বুঝতে চায়নি। ঘুমের ঘোরে দুই তিন দিন দৈহিক মিলন হয়েছে। মাঝে মধ্যে একতরফাভাবে ঘুমন্ত স্বামীর সঙ্গে মিলন করেছি।

আপনি উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছেন। এখন উঠি।

না, তুমি যাবে না। তুমি বলেছিলে না, খুশি হয়ে আমি যা খেতে দেবো তুমি তা–ই খাবে। এখন খুশি মনে আমাকে তোমার মাঝে সমর্পণ করছি।

না, তা হয় না।

কেন, হয় না? তুমি তো আমিনের মতো নও।

বলেই তিনি নিজ হাতে তার ব্লাউজ, ব্রা, শাড়ি, পেটিকোট খুলে ফেলে দিলেন দূরে। এরপর দরজা বন্ধ করে ধীরে ধীরে আমার কাছে এসে আমার ঠোট তার ঠোটে নিয়ে চুষতে লাগলেন। এরপর ধীরে ধীরে খাটের ওপর বসে আমাকে তার কাছে আহ্বান করেন।

নগ্ন নারীদেহের আহ্বান কি যে আকর্ষণীয় সে সময় বুঝতে পারলাম। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার কাছে চলে গেলাম।

বুড়িআপা পরম যত্নে আমার বস্ত্র উন্মোচন করে নিজের ভেতরে প্রবেশ করতে সহায়তা করেন। জ্যৈষ্ঠের খরতাপের মাঝে এক পশলা বৃষ্টি যেমন মাটির উত্তাপ কমায় ঠিক তেমনি বুড়িআপার উত্তাপ কমে।

বুড়িআপা কাপড় পরতে চাইলে বাধা দিয়ে বললাম, লজ্জার কিছু নেই। কাপড় ছাড়াই আপনাকে আরো আকর্ষণীয় লাগছে।

মন ভরে তার সমস্ত দেহ দেখলাম। নব দম্পতির মতো আবার উত্তাপ কমালাম।

দুপুরে খাওয়ার পর পাশাপাশি শুয়ে থাকার সময় বুড়িআপা বললেন, আজ তুমি আমাকে যে শান্তি দিলে এ রকম শান্তি আমি এ জীবনে পাইনি। এখন মনে হচ্ছে আমার শরীর ভারমুক্ত। জানি, কাজটি খারাপ করেছি। কিন্তু বিশ্বাস করো এই দেহের ভার আমার সহ্য হচ্ছিল না। গত দুই দিন অনেক চিন্তা ভাবনা করে তোমাকে সিলেক্ট করেছি। আশা করি, এই ঘটনা দুঃস্বপ্ন মনে করে ভুলে যাবে।

ভুলে যেতে বললেই কি ভুলে যাওয়া এতো সোজা? আজ আপনাকে ভারমুক্ত করে নিজেও তো ভারমুক্ত হয়েছি। এই ভারমুক্তির স্বাদ কি ভোলা যায়?

যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়ে করো এবং যতোদিন বিয়ে না হচ্ছে ততোদিন মাঝে মধ্যে আমার কাছে এসো।

এরপর আবার ভারমুক্ত হয়ে সেদিনের মতো বিদায় নিই।

কিছু কাল পরে বাবা-মা আমার বিয়ে ঠিক করেন।

এ কথা জানানোর পর বুড়িআপা স্মৃতি হিসেবে আমার সন্তান গর্ভধারণ করতে চান। বৈধতার প্রশ্নে জানান, পরিচয় হবে আমিনের, শুধু আমরা দুজন জানবো এ সন্তান আমাদের।

অনেক বাক্য বিনিময়ের পর তার কথা মেনে নিলাম।

এখন আমার স্ত্রী পরম সোহাগে ও ভালোবাসায় আমার দেহ-মন ভারমুক্ত করে। ফলে বুড়িআপার কাছে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন পড়ে না।

ময়মনসিংহ থেকে

গাদা

– সারওয়ার জামান চন্দন

ভোরবেলা যখন বাড়ি থেকে বের হই তখন বেশ শীত লাগছিল।

নৌকায় চড়ে কিছুক্ষণ আগে পদ্মা নদী পার হয়েছি। তারপর চরের মধ্যে দিয়ে এক কিলোমিটার মতো হেটেছি। চারদিকে বালি আর বালি। রোদ পড়ে বালিগুলো চিকচিক করছে। শীতের রোদ এখন আর মিষ্টি বোধ হচ্ছে না। বালি ক্রমেই উত্তপ্ত হচ্ছে। আমি গা থেকে সোয়েটারটা খুলে কোমরে বাধলাম। দুই চারটি দোকান মিলিয়ে একটি বাজার পাওয়া গেল।

এর মধ্যে একটি চায়ের দোকানও আছে। উদাস লোকটির মুখোমুখি বসে দুজন চা খাচ্ছে। তারা ক্রমাগত পা নাচাচ্ছে, একজনের ঠোটের কোণে এক চিলতে হাসি। উদাস লোকটির চুলগুলো কাচাপাকা ঢেউ খেলানো, অনুর্বর মুখে অল্প কিছু খোচা খোচা দাড়ি। গায়ে একট ফুলহাতা শার্ট।

একটি ছেলে বললো, আচ্ছা, বলেন তো ইংরেজি কি হবে, এমদাদ চা খায়।

লোকটি উত্তর দিল, এমদাদ টেকস টি।

ছেলেটি বললো, আপনারটি ভুল হয়েছে।

লোকটি এবার আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন, এমদাদ কখনো ভুল ইংরেজি বলে না।

লোকটির নাম এমদাদ।

আরেকটি ছেলে জানতে চাইলো, আচ্ছা, আপনি গাদা-র কি দেখে মজেছিলেন।

এমদাদ আবার কিছুটা উদাস হলেন। হয়তো কিছুটা আহত বোধ করছেন। তিনি পা নাচিয়ে উত্তর দিলেন, আমি গাদার চুল দেখে পাগল হয়েছিলাম।

এমদাদ এখন এক নামে *গাদার পাগল* বলে পরিচিত।

ধান ক্ষেতের আল দিয়ে হাটতে হাটতে এমদাদ হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেল। আল যে একেবারে সরু এমন নয়, রাতের কুয়াশায় ঘাস অবশ্য কিছুটা ভেজা ছিল। কিন্তু আসল কারণ হচ্ছে, এমদাদ কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। কিছু দিন থেকেই সে মাঝে মধ্যে গাদার কথা ভাবতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

উঠে গিয়ে সে আবার জোর কদমে হাটতে লাগলো। হাওয়ায় গায়ের শার্টটি উড়ছে। সে আবার ভাবতে লাগলো, স্কুলে পৌছালেই গাদাকে দেখতে পাওয়া যাবে। গাদা তার সমস্ত সত্তাকে ক্রমে, অক্টোপাসের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলছে। দূরে সবুজ ধান ক্ষেতের মধ্যে লাল শাড়ি পরে একটি মেয়ে এগিয়ে আসছে। সে নির্ঘাত গাদা।

এমদাদের এক ক্লাস নিচে পড়ে গাদা। এমদাদ এবার ক্লাস টেনে। গ্রামের এতোটুকু একটা মেয়ে নিজের আগ্রহে যে লেখাপড়ায় এটুকু এগিয়েছে এ জন্য এমদাদ বিস্ময় বোধ করে। লেখাপড়ার পাশাপাশি সে নাকি নকশী কাথার কাজেও বেশ সিদ্ধহস্ত।

এমদাদ মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

এমদাদের আব্বা গ্রামের একজন সচ্ছল লোক। তবে অনেক জমি নদীর ভাঙনে বিলীন হয়ে গেছে। আবার হয়তো কখনো সেগুলো জেগে উঠবে। অল্প কিছু জমি চষে যে ফসল পায় তাতে সচ্ছলতা আছে। কিন্তু বিলাসিতার সুযোগ নেই।

গাদার আব্বা শান্তিপ্রিয় সুখী মানুষ। তার ওপর যোগ হয়েছে তার একমাত্র মেয়ের প্রতিভা। সব কিছু মিলিয়ে তিনি ভবিষ্যতে এক সুন্দর স্বপ্ন দেখেন।

হৃদয়হরণ জনিত গল্প খুব একটা চাপা থাকে না। মানুষ একটু শুনলে আরেকটু বেশি করে বাড়িয়ে বলতে বেশ পছন্দ করে। এমদাদ-গাদার সম্পর্কের কথাটাও বেশি দিন চাপা থাকলো না। দুই একজন করতে করতে গোটা গ্রাম ছড়িয়ে পড়লো। সেকেন্দার আলীর কানেও এক সময় সে কথা গিয়ে পৌছালো। ইংরেজিতে কথা বলতে পারায় তিনি ছেলেকে মনে মনে শ্রদ্ধা করেন। তবে এ কথা শুনে ছেলের ওপর তিনি কিছুটা অপ্রসন্ন হলেন। *প্রথমত.* ছেলের বিয়ে তিনি বছর খানেক দেরি করতে চান। *দ্বিতীয়ত.* ছেলে যে মেয়েকে পছন্দ করে তাদের আর্থিক অবস্থা ভালো না।

এমদাদ দারুণ আত্মবিশ্বাসী। তার ধারণা, সেকেন্দার আলী একদিন সব ঠিক ঠিক মেনে নেবেন। এক সময় সব ঠিক হয়ে যাবে।

গাদার চোখে স্বপ্ন স্বপ্ন খেলা। আশপাশের সব কিছু তাকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে।

সবার অনুরোধে ফজলু মিয়া মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে সেকেন্দার আলীর কাছে গেল। ফজলু মিয়ার মধ্যে একটা লোভ ভর করেছে। তার আদুরে মেয়েটার ভালো একটা বিয়ে হবে। মেয়েটা রানীর হালে থাকবে। আনন্দে কল্পনায় তার চোখের কোণ চিকচিক করে উঠলো। কিন্তু মানুষের ভাবনা সব সময় ঠিক পথে এগোয় না।

বিয়ের প্রস্তাবে সেকেন্দার আলী তাকে ভর্ৎসনা করলেন। বাড়ি ফিরে ফজলু মিয়া মেয়েকে সব কিছু জানালেন এবং বললেন, এই বিয়ে নিয়ে তুমি যদি আর না ভাবো তবে আমি খুশি হই।

গাদা তার আব্বাকে ভালোবাসে। তার আব্বার কথায় সে কষ্ট পেলেও বেশি কষ্ট পেয়েছে তার আব্বাকে অপমান করায়। মনের মধ্যে ভালো লাগার যে উচ্ছলতা ছিল তা ক্রমেই শিথিল হয়ে পড়লো। সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে ফেললো, যে লোক তার আব্বাকে অমন কুৎসিত অপমান করতে পারে সে লোক কখনো তার শ্বশুর হতে পারে না।

পদ্মা চরের এ গ্রামে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ তেমন গড়ায়নি। তাই যুদ্ধবিগ্রহ তাদের জীবনে তেমন প্রভাব ফেলে না। মোড়ল গোছের কেউ মাঝে মধ্যে শহরে গেলে মুখ অন্ধকার করে গ্রামে ফিরে আসে। মুখে বলে, দেশের অবস্থান ভালো না, যে কোনো সময় যুদ্ধ লেগে যেতে পারে। সাধারণ অশিক্ষিত মানুষ বুঝতে পারে না কি জন্য যুদ্ধ, কার সঙ্গে যুদ্ধ। প্রতিদিনকার মতো ফজরের আজানের সঙ্গে তাদের কাজকর্ম শুরু হয় আর সূর্য ডোবার সঙ্গে জীবন থেমে যায়। কেউ কেউ আছে যারা পূর্ণিমার রাতে নদীর ধারে বসে অনেক রাত পর্যন্ত গল্পগুজব করে।

এমদাদ ইদানীং তাদের সঙ্গে চলাফেরা করছে। তারা একদিন শুনতে পায় শহরে পাকিস্তানি মিলিটারি ঢুকে পড়েছে। যুদ্ধ লেগে গেছে। দুই একটা নাকি বোমাও ফেটেছে।

যুদ্ধের কথায় এমদাদের মনে উত্তেজনা বয়ে যায়। কয়েকদিনের ভেতর একটা দলের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। দলটি সীমান্ত পার হয়ে ওপারে যাচ্ছে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে। চর থেকে সীমান্ত মাত্র ঘন্টা খানেকের পথ।

তাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে এগিয়ে যায় এমদাদ। তারপর হাপাতে হাপাতে গাদার কাছে ফিরে এসে বললো, গাদা, আমি যুদ্ধে যাচ্ছি।

যুদ্ধের কথা শুনে গাদা প্রথমে হকচকিয়ে গেল।

আর এমদাদের ভেতর একদিকে যুদ্ধের উত্তেজনা, অন্যদিকে প্রথমবারের মতো কোনো নারীকে স্পর্শ করার উত্তেজনা। গাদার হাতে চুমু দিয়ে সে বললো, লক্ষ্মী, আমার জন্য দোয়া করো।

আকাশ–পাতাল চিন্তায় গাদার তখন মাথা খারাপ। এমদাদকে সে কি যেন বলতে চাইলো। কিন্তু শব্দ হয়ে তা ফুটে বের হলো না। গলার কাছে এসে সব কিছু কেমন জট পাকিয়ে গেল।

যুদ্ধে যাবার মুহূর্তে গাদার আটকে যাওয়া কথাটি এমদাদের যে আর কখনো ঘনিষ্ঠভাবে শোনা হবে না, এমনটি ভাবেনি। ট্রেনিং ক্যাম্পে বা অবসরে সে ভেবেছে, একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। দেশ স্বাধীন হবে। সেকেন্দার আলী সব মেনে নেবেন। গাদাকে সে বিয়ে করবে। এমন স্বপ্ন বুকে নিয়েই সে যুদ্ধের দিনগুলো পার করে দিয়েছে। কতো যে গল্প জমেছে।

একদিন হলো কি, কানের একদম কাছ দিয়ে শা করে একটা গুলি বেরিয়ে গেল। গাদাকে এসব গল্প শোনাতে যে কতোদিন লাগবে তার কে জানে?

গ্রামে ফিরে এমদাদ কিছুই পরিবর্তন দেখতে পেল না। ঘর–বাড়ি, মাঠ সব ঠিক আছে। শয়তান পাকিস্তানিরা শেখ পর্যন্ত নদী পার হয়ে এ গ্রামে আসতে পারেনি। তবে ছোট একটা পরিবর্তনের কথা শোনা গেল। গাদার বিয়ে হয়েছে।

বিয়ের কথা শুনে এমদাদ একেবারে চুপচাপ হয়ে গেল। শেষে ছয় দিনের মাথায় বিড়বিড় করে শব্দ করে উঠলো। মনে হলো সে একটা সুর মেলাতে চাইছে। শেষ পর্যন্ত বললো, *নিনিং নিনিং, নিনিং নিনাং।* তারপর আবার কথা বলা বন্ধ করে দিল, সঙ্গে খাওয়া–দাওয়াও ছেড়ে দিল।

কিছু দিন এমন চলতে চলতে এক সময় সে দুটো কথা আবিষ্কার করে ফেললো। চুপচাপ সময়ের মধ্যে সে যে কথাটুকু বলে তা এ দুটো বাক্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

গাদা কেন এলো না, কিছু ভালো লাগে না,

কিছু ভালো লাগে না, গাদা কেন আসে না।

গ্রীষ্মকালে এমদাদের পাগলামির মাত্রাটা বেড়ে গেল। সেকেন্দার আলী পড়লেন মহা চিন্তায়। কবিরাজ দিয়ে অনেক ঝাড়–ফুক হলো, কোনোটাতেই কোনো কাজ হয় না।

এমদাদের মুখে একই কথা। খাওয়া–দাওয়া ঠিকমতো করে না। গরমে অসহ্য হয়ে গেলে চরের মধ্যে উলঙ্গ হয়ে বসে গাদার জন্য কাদে।

গাদার শ্বশুরবাড়ি গিয়ে সে একদিন উপস্থিত হলো। কিন্তু ভেতরে ঢোকার সাহস পেল না। বাড়ির বাইরের গাছের ওপর উঠে সে দেখতে পেল গাদা বসে মাছ কুটছে। এমদাদ গুনগুন করে গেয়ে উঠলো–

গাদা মাছ কুটে রে বটিতে পা দিয়া

এমদাদ কাদে তার জন্য,

তার কিছু মনে পড়ে না!

গাদা মাছ কুটে রে বটিতে পা দিয়া।

ছেলের চিন্তায় সেকেন্দার আলীর শরীর ভেঙে গেল। ছেলের একটা বিহিত–ব্যবস্থা করার জন্য তিনি নিজে গাদার কাছে ছুটে গেলেন। গাদাকে এমদাদের সব কথা বললেন। গাদার স্বামী কাশিম অতিশয় ভদ্র অথবা সেকেন্দার আলী তাকে টাকা–পয়সা বা জমি–জায়গার লোভ দেখিয়ে থাকতে পারে। সেকেন্দার আলীর অনুরোধ কাশিম শুনলো।

কাশিম বললো, *গাদা তুমি সবই শুনেছো।* এমদাদ তোমার জন্য পাগল হয়ে যাচ্ছে। ছেলেপুলেরা নাকি আজকাল পেছন থেকে ঢিল ছুড়ে পাগল পাগল বলে চিৎকার করে।

গাদার ভীষণ কান্না পাচ্ছে। সে নিজেকে ধরে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

কাশিম আবার বললো, সেকেন্দার আলী তোমার কাছে তার ছেলের প্রাণ ভিক্ষা চাইছেন।

গাদা এবার একটু শক্ত হয়ে বললো, তো আমি কি করতে পারি?

গাদা, আমার পক্ষ থেকে কোনো আপত্তি নেই। তুমি যদি এমদাদের কাছে যেতে চাও তবে আমি ব্যবস্থা করতে পারি। কাশিম বলল।

সেকেন্দার আলী তোমাকে বলতে বলেছে, না? তোমাকে টাকা–পয়সার লোভ দেখায়নি?

গাদা, তুমি এক সময় এমদাদকে ভালোবাসতে সে জন্যই বলছিলাম। কাশিম অপ্রতিভ হয়ে জবাবদিহি করলো।

হ্যা, এক সময় ভালোবাসতাম। কিন্তু এখন তো বাসি না। আমার আব্বা একদিন বিয়ের প্রস্তাবও নিয়ে গিয়েছিলেন। তবে সেকেন্দর আলী তাকে কুৎসিত অপমান করেছিল, কারণ আমরা গরিব ছিলাম। এখন তার ছেলে পাগল হয়ে যাচ্ছে, তিনি তার সম্পদ দিয়ে ছেলেকে রক্ষা করুক। আমি কি করতে পারি। আমি আমার গরিব আব্বাকে অসম্মান করতে পারবো না।

গাদা, আবারও বলছি, তুমি তাকে একদিন ভালোবাসতে।

আচল উঠিয়ে চোখ মুছতে মুছতে গাদা বললো, দিনের পর দিন নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে আমি এমন জায়গায় এসে গেছি যে, আর পেছন ফেরা সম্ভব নয়।

কোনোভাবেই না?

না, আর কোনোভাবেই না। দয়া করে তুমি আমাকে আর অনুরোধ করবে না।

পরিশিষ্ট : সেকেন্দার আলী মারা গেছেন। এমদাদের মাথার চুল বেশির ভাগই পেকে গেছে, দাড়িও। কিন্তু সরিষার তেলের কারণে চুলগুলো হলুদ রঙ ধারণ করেছে। ইংরেজিটা তিনি মোটামুটি নির্ভুল বলেন। অল্প বয়সীরা জানতে চাইলে পা ঝুকিয়ে উত্তর দেন, তিনি গাদার চুল দেখেই পাগল হয়েছিলেন।

শীতকালে মাথা মোটামুটি শান্ত থাকে। তবে গরম পড়লেই পাগলামিটা দেখা দেয়। চরের মধ্যে উলঙ্গ হয়ে তখন গড়াগড়ি করেন। পড়ন্ত সূর্যের রোদে তার ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। বালি দিয়ে গাদার জন্য ঘর বানান। পরক্ষণে হয়তো ঘর ভেঙে ফেলে চিৎকার করে কাদতে বসেন। রাতের বেলা বালি ঠাণ্ডা হলে নির্জন চরে উলঙ্গ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে একটি মানব শিশু।

সেনপাড়া, মিরপুর, ঢাকা থেকে
sarwar_35@yahoo.com

শুধু তোমাকেই

– মোনালিসা

মাসুদ,

এখন অনেক রাত। সমস্ত প্রকৃতি নিঝুম রাতের নিস্তব্ধতায় বিলুপ্ত। এ মুহূর্তে তোমাকে খুব মনে পড়ছে। বার বার ইচ্ছে করছে তোমাকে দেখতে। আজ কয়েকদিন হলো তোমাকে দেখিনি, তোমার সঙ্গে কথা বলিনি। খুব কষ্ট হচ্ছে আমার।

তুমি কি জানো, তোমাকে একদিন না দেখলে আমার খুব কষ্ট হয়! একটা দিন মনে হয় যেন একটা বছরের মতো। তোমার কি এ রকম কষ্ট হয়? আজ বার বার শুধু অতীতের কথা মনে পড়ছে। তোমার কি মনে আছে সেদিনটির কথা? সেই চার বছর আগে রৌদ্র উজ্জ্বল একটা দিনে তুমি আমাকে প্রথম বলেছিলে, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

খুব ভয়ে ভয়ে বলেছিলাম, উত্তর পরে জানাবো।

এর কিছু দিন পর তোমাকে না করে দিলাম। তোমার কেমন লেগেছিল তখন জানি না। এখন আফসোস হচ্ছে, কেন যে সেদিন নিষেধ করে দিলাম তোমাকে! এরপর আমার সঙ্গে তুমি অনেক খারাপ ব্যবহার করেছো, অনেক বাজে আচরণ করেছো। ফলে তোমাকে খুব ঘৃণা করতাম। এতো বেশি ঘৃণা করতাম যে, তোমাকে দেখলে রাগে আমার শরীর জ্বালা করে উঠতো। ধীরে ধীরে সে ঘৃণা ভালোবাসায় পরিণত হলো।

ঘৃণার মধ্য দিয়ে যে ভালোবাসার জন্ম হয়, কথাটা আগে বিশ্বাস করতাম না। এখন তার বাস্তব প্রমাণ পেলাম। যে তোমাকে দেখলে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিতাম এখন সেই আমি তোমাকে না দেখলে থাকতে পারি না। ছটফট করি সারাক্ষণ তোমাকে একটু দেখার জন্য। তোমাকে ভালোবেসে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি তোমার মাঝে। তুমি তো আমার শরীরের প্রতিটি রক্তবিন্দুতে জড়িয়ে আছো, মিশে আছো আমার আত্মার সঙ্গে। তোমাকে ভালোবেসে বুঝলাম ভালোবাসা কতো সুন্দর! যেদিকে তাকাই সেদিকে শুধু তোমার হাসি ভরা মুখটাই দেখি। বইয়ের পাতায় চোখ রাখলে সেখানেও তোমার ছবি ভেসে ওঠে। মাঝে মধ্যে ভয় হয় তোমাকে যদি আমার জীবন থেকে হারিয়ে ফেলি তখন কিভাবে বাচবো! তুমি কি পারবে না তোমার ভালোবাসা দিয়ে আমাকে তোমার বুকে জড়িয়ে রাখতে? আমাকে সারা জীবনের জন্য তোমার করে নিতে? মাঝে মধ্যে একাকী ঘরে সঙ্গ বিহীন প্রাণটা যখন ব্যথায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে তখন কল্পনার নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ধীরে ধীরে তুমি আমার পাশে এসে বসো। তোমার সঙ্গে মনের কথা বলি সঙ্গোপনে যা তোমাকে সামনে বলতে পারি না। দীর্ঘ সংসার

যাত্রার দুর্গম পথে সহায় বা সহযোগী হিসেবে যার কথা ভাবতে ভালো লাগে সেতো তুমি। আমার সমস্ত হৃদয় জুড়ে যে, তুমি বাস করছো। সেখানে আর কারো স্থান হবে না কোনোদিন।

কতো আশা আর কতো স্বপ্ন নিয়ে মানুষের জীবন। আমার সব আশা, সব স্বপ্ন তোমাকে ঘিরে। আমার কতো ইচ্ছে ছিল তোমাকে আমার মনের মতো করে গড়ে তুলবো। কিন্তু আমি যা অপছন্দ করি তা তুমি খুব বেশি পছন্দ করো। তাই মাঝে মধ্যে কষ্ট হয়।

তুমি বলেছো, ভালোবাসার মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো বিশ্বাস। তোমার প্রতি যেন কোনোদিন বিশ্বাস না হারাই।

তোমাকে আমি খুব বিশ্বাস করি, খুব ভালোবাসি। তাই ভালোবাসার অধিকারে বলছি, আমার সেই বিশ্বাসের অমর্যাদা করো না কোনোদিন। আমাকে কখনো কষ্ট দিওনা। তোমার দীর্ঘ পথ চলার সঙ্গী হিসেবে আমাকে তোমার পাশে রেখো সারা জীবন।

প্রেম আর বিশ্বাসের আলো হাতে নিয়ে চলো এগিয়ে যাই সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে। ভালোবাসার আলোয় আলোকিত হোক তোমার আমার জীবন। ভালোবাসা দিবসে এই কামনা করি।

মীরসরাই, চট্টগ্রাম থেকে

পিশাচ

- ফুল সুন্দরী

প্রকৃতপক্ষে ভালোবাসার যে কেমন অনুভূতি তা জানি না। কারণ কাউকে পুরোপুরি ভালোবাসতে পারিনি। সহজ কথায়, কাউকে ভালোবাসিনি। কেননা আমি যে হোচট খেতে খেতে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তার কারণ হলো, বয়সের জন্যে সাধারণত একটু সুন্দর কাউকে দেখলেই ভালোলাগে। কিন্তু সবাইকে তো আর ভালোবাসা যায় না!

আমার এক ভাবীর ভাই যার নাম রাহাত, সঙ্গত কারণে তার নাম পরিবর্তন করে দিলাম। সে দেখতে সুন্দর। আর আমার চোখে সে মহা সুন্দর। সে আমার কাছে যেন হাজার বছরের সাধনার ধন। তার এবং আমার বয়সের পার্থক্য খুব কম। আনুমানিক তিন থেকে চার বছর হবে।

তার বাড়ি ঢাকায়। সে খুলনায় আসে এসএসসি পরীক্ষায় পাস করে পলিটেকনিক কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। সে লেখা পড়ায় খুব খারাপ। এসএসসি পরীক্ষায় প্রথমবার অংকে ফেল করছিল পরেরবার সি গ্রেডে পাস করেছে। আমি সব জানি। তবুও তাকে আমার ভালো লাগে। কথায় আছে, *পিরিতের পেতনিও ভালো* সে রকম।

ধীরে ধীরে তার প্রতি দুর্বল হতে লাগলাম। ভালো লাগা থেকে আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করলাম। আমার বান্ধবীদের ওর কথা বললাম। আমার বই-এর সব জায়গায় ওর নামের অক্ষর লিখতে লাগলাম। কিন্তু আমি যেখানে ভুল করেছিলাম তা হলো, ওকে কখনো বলিনি যে, আমি ওকে ভালোবাসি। এমন কি কখনো এমন ব্যবহারও করিনি যাতে ও বুঝতে পারে।

কখনো স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি যে, আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় শুদ্ধ হয়ে যাবে। সেদিন এটা বুঝতে পারলাম যেদিন ওর সম্পর্কে সব শুনলাম। আমার যে সেদিন কি হয়েছিল নিজেকে নিজেই কিছু বোঝাতে পারছিলাম না। ভাবতে পারছিলাম না যে, ও ওরকম হতে পারে। যার ওপরটা এতো সুন্দর তার ভেতরে ওরকম পচা দুর্গন্ধ লুকিয়ে আছে!

ঘটনাটা প্রথম শুনি আমার দাদির কাছে। যে, ওর কলেজ থেকে কিছু দূরে একটা মেয়েকে ও অনেক দিন ধরেই ভালোবাসতো। তার সঙ্গে যে ওর সম্পর্ক তা সেই মেয়ের মা বাবা জানতো না। তবে রাহাত যে প্রায় সেই

মেয়েদের বাড়ি আসা-যাওয়া করতো তা সেই মেয়ের মা বাবা জানতো। পরিচয় জিজ্ঞাসা কররে বলতো যে, একসাথে কোচিংয়ে পড়ে। ওদের ভালোবাসার মধ্যে প্রথমে কোনো চাওয়া-পাওয়া না থাকলেও পরে ওদের মধ্যে চাওয়া-পাওয়ার প্রশ্ন জাগে। একজন আরেকজনের কাছে কিছু পেতে চাইলো। কিন্তু সেই পরিবেশ কোথায়?

একদিন সেই মেয়ের মা তার কোন এক কাজে বাইরে গেলে রাহাত ওদের বাড়ি যায় এবং পেয়ে যায় সেই সুবর্ণ সুযোগ। সে মেয়েটির সব কিছু লুটে নেয়ার চেষ্টা করে এবং মেয়েটিও ফাকা বাড়ি ভেবে নিজেকে তুলে দেয় ওর হাতে। দুজনের ইচ্ছায় দুজন লেনা-দেনা শোধ করতে চাইছিল।

কিন্তু বিধি বাম। হঠাৎ তার মা বাড়ি চলে আসেন এবং তাদের দেখে সব বুঝে ফেলেন। তার মা তার বাবাকে ফোন করে অফিস থেকে ডেকে আনেন। এবং রাহাত বোনের বাসায় অর্থাৎ ভাবীদের কাছে ফোন করে এবং তাদের আসতে বলে।

তারা এলে মেয়ের মা বাবা রাহাতের সঙ্গে বিয়ে দিতে চায়। এবং তারা কাজি ডেকে আনে। কিন্তু রাহাত তখন হঠাৎ বেকে বসে। সে বলে যে, তাকে ভালোবাসতাম এবং এখনো বাসি। তাই বলে তাকে বিয়ে করতে পারবো না। ভাবীরাও এটা চাইছিলেন। কারণ রাহাতের সেই প্রেমিকারা ছিল খুব গরিব।

সবশেষে তাদের দশ হাজার টাকা দিয়ে ঘটনা কিছুটা শান্ত করে রাহাতকে নিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। পরে অবশ্য ভাইয়া ওকে অনেক মার মেরেছিলেন।

আমি যে এ রকম একটা লম্পটের হাত থেকে বেচেছি তার জন্য খোদার কাছে হাজার শোকর। আমি শুধু মেয়েদের বলবো, কেউও আমার মতো কোনো ছেলের চেহারা দেখে তাকে ভালোবেসো না আর ওই মেয়ের মতো দুই দিনের প্রেমিকের হাতে নিজের দেহটাকে তুলে দিও না। কারণ আমরা মেয়েরা বড় দুর্বল ও নিঃস্ব। আমাদের কাছে যদি কিছু থাকে তা হলো, আমাদের ইজ্জত, আমাদের বিশ্বাস এবং তা হারিয়ে ফেললে আমরা নিজেদের ঠিক রাখতে পারি না। তখন দেখা যায়, বোকার মতো মৃত্যুকে বরণ করি। কিন্তু এটাই আমাদের একমাত্র ভুল। ফলে ওই সব পিশাচেরা আমাদের ঠকাতে পারে।

এরপর থেকে কান মলেছি, কাউকে কখনো ভালোবাসবো না এবং এই ভুল যাতে আর কখনো না হয় সে জন্য আজ পর্যন্ত কোনো ছেলের দিকে চোখ তুলে তাকাই না।

ঠিকানা বিহীন

পাগল পাঠক

- মাছুম

আমরা যারা ইটালি-র রোম শহরে থাকি তাদের সাপ্তাহিক *যায়যায়দিন* পত্রিকা পেতে মাঝে মধ্যে সমস্যায় পড়তে হয়। বিশেষ করে *যায়যায়দিন*-এর বিশেষ সংখ্যাগুলোর ক্ষেত্রে। কারণ অনেকেই আছেন যারা সাধারণ সংখ্যাগুলো না কিনলেও বিশেষ সংখ্যা কেনার জন্য বৃহস্পতিবার দোকানগুলোতে ভিড় করেন। এরও কারণ হলো, ঢাকা-টু-রোম বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট সপ্তাহে দুই দিন অর্থাৎ রোববার এবং বৃহস্পতিবার। আর যায়যায়দিন বের হয় মঙ্গলবার। তাই যায়যায়দিন পেতে আমাদের দুই দিন অপেক্ষায় থাকতে হয়।

একবার আমার ডিউটি সেরে বৃহস্পতিবার আসতে একটু দেরি হয়ে গেল। সেদিন যায়যায়দিনের বিশেষ সংখ্যা আসবে এটা আমার জানা ছিল। এসে দেখি সবগুলো দোকান থেকে যায়যায়দিন পত্রিকা উধাও। কি করি! এ দোকান, সে দোকান ঘুরে না পেয়ে ফিরে আসছি নিরাশ হয়ে। এমন সময় এক দোকানি বললো, *আমার কাছে একটা যায়যায়দিন আছে তবে বিক্রি করবো না, আমিই পড়বো।*

দোকানিকে দ্বিগুণেরও বেশি দাম দিতে চাইলেও সে নারাজ। আমিও নাছোড়বান্দা। কি করা যায় ভাবছি! কারণ ইতিমধ্যে কয়েক জায়গায় খোজ নিয়ে জানতে পেরেছি, আমার বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই বিশেষ সংখ্যাটি হস্তগত করতে সক্ষম হয়নি।

তারপর আমার মাথায় একটা বুদ্ধি চাপলো। দোকানিকে দশ মিনিটের জন্য পত্রিকাটি দিতে রাজি করিয়ে পাশের ফটোকপির দোকানে গিয়ে একশ আটাশ পৃষ্ঠার পুরো যায়যায়দিন প্রায় পনের ইওরো দিয়ে ফটোকপি করে নিয়ে আসি এবং দোকানিকে ধন্যবাদ দিই।

আজও দোকানি আমাকে দেখলে যায়যায়দিন-এর *পাগল পাঠক* বলে। তিনি কখনো পত্রিকা পড়ার জন্য এমন পাগল দেখেননি।

রোম, ইটালি থেকে

ঝামেলা

– অরাত্রিকা হুসেইন

স-এর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল কাককতালীয়ভাবে। গত বছর ফেব্রুয়ারিতে ভুল করে আমার মোবাইলে সে ফোন করে। তারপর মাঝে মধ্যে করে। ইচ্ছে করে আসল পরিচয় কখনো দিইনি। তাতে অবশ্য আমাদের কথোপকথনে কোনো সমস্যা হয়নি। কারণ সে একতরফাই বলতে গেলে কথা বলতো। মাঝে মধ্যে শুধু হু হা করতাম।

দীর্ঘ দিন এই কথাবার্তা চললেও কখনো তার সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাইনি। প্রথম প্রথম বললেও পরে সেও আর দেখা করতে বলতো না।

এরই মধ্যে আমার বিয়ের কথা প্রায় পাকা হয়ে যাচ্ছিল। এ কথাবার্তা চলার সময়ই পাত্র ও আমার মধ্যে দুই পক্ষের বাবা-মা উদ্যোগী হয়ে যোগাযোগ করিয়ে দেন। আমাদের কথাবার্তা বলতে উৎসাহী করেন।

ছেলের সঙ্গে আমি কথাবার্তা বলতে বলতে সামান্য এটাচড হয়ে পড়ি। তাছাড়া এমনভাবে কথা বলতো যাতে মনে হতো সে আমার জন্য পাগল হয়ে গেছে।

অবশ্য সত্যি বলতে কি, আমি এ ধরনের কথা শুনতে অভ্যস্ত। আমি সুন্দরী নই। কিন্তু আমার সঙ্গে মিশলে ছেলেদের ভেতর দুই ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়।

একদল আমার প্রাণের বন্ধু হয় যারা আমার জন্য একজন ভালো বন্ধুর মতো সব করে।

আরেক দল আমাকে পাবার জন্য পাগল হয়।

কাজেই পাত্রটির কথায় আমি টলে যাবার পাত্রী নই। কিন্তু এক্ষেত্রে ক্যাটালিস্ট হিসেবে কাজ করেছে দুপক্ষের মায়ের অকুণ্ঠ সমর্থন। অনেকটা লিগাল অ্যাফেয়ার ম্যারেজের অবস্থা। আমি যখন মনকে এখানে বেধে দিতে প্রস্তুত তখনই পারিবারিকভাবে বিয়ে ভেঙে গেল।

অভিভাবকদের মধ্যে মতবিরোধ হলেও আমি ভেবেছিলাম, পাত্র আমাকে বলবে, আরে, ভয়ের কিছু নেই। আমার দিক আমি ম্যানেজ করবো। তোমারটা তুমি করো। আমরা ঠিক থাকলে তারা রাজি হবেনই।

কিন্তু যার আশায় ছিলাম সেই দেখি কাচুমাচু করে। জীবনে কোনোদিন কোনো বিপদের মুখোমুখি হয়ে ভয় পাইনি। আর যাকে জীবন সঙ্গী করবো তার হাটু কাপতে দেখে আল্লাহকে ধন্যবাদ দিয়েছি অজস্রবার। আমিই তাকে না করে দিয়েছি। ঠিক যতোটা শক্ত হয়ে তাকে আমার জীবন থেকে বের করে দিয়েছি ঠিক ততোটাই শক্ত থাকতে পারিনি। আমার অবিশ্বাস গড়ে উঠছে ছেলেদের ব্যাপারে।

প্রথমবারের মতো একজনকে আমার সঙ্গে যুক্ত করতে রাজি হলাম। তার পৌরুষের স্বরূপ দেখে আমি হতবাক। ভালোবাসা যদি এতোই ঠুনকো হয় তবে সে ভালোবাসা ছাড়া জীবন কাটিয়ে দিতে পারবো।

আরো ভাবতাম, আমার স্বপ্ন, আবেগ কেবল একজনের জন্য। গাধার মতো তার অপেক্ষায় বসে থাকতাম। ওই ঘটনার পর আমার মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন এলো। প্রেম-ভালোবাসা নিয়ে কোনো আবেগই নেই। এমন সময় *স* দেখা করতে চাইলো।

দেখা করলেই কি, না করলেই বা কি!

শেষ পর্যন্ত দেখা করে ফেললাম।

এ ছেলে আরো নাটুকে। পরের দিন থেকেই আমাকে বিয়ে করতে চায়।

দেখা করে ভালো ঝামেলায় পড়লাম। ঝামেলা এড়াতে বললাম, সিভি দাও, বাসায় দেখাই। রাজি হলে দেখা যাবে।

আমার মায়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব খোলামেলা। সোজাসাপ্টা কথা বলে মায়ের হাতে সিভি দিয়ে দিলাম। আমি নিশ্চিত যে বাতিল হবেই। ওমা! উল্টো ব্যাপার, মা তো চাদ না সৌরজগতের একমাত্র সূর্যটাই মনে হলো পেয়েছেন।

একদিকে ছেলের হিন্দি সিনেমা মার্কা প্যানপ্যানানি, অন্যদিকে মায়ের নাচ। মাঝখানে আমি স্যান্ডউইচ। জীবন তিতা হয়ে গেল।

তবে ঘটনা হিন্দি সিরিয়ালের মতো অনন্তকাল চলার সময় পেল না। *স* এবং মা মিলে ইংরেজি সিনেমার মতো দ্রুত সমাপ্তিতে নিয়ে এলো।

দেখা-দেখি, পাকা কথা, সব শেষ। এখন শুধু আনুষ্ঠানিকতা বাকি।

স যখন গদগদ স্বরে বলে, *তুমি আমার* তখন আমার বিরক্তিতে চার তলা থেকে লাফ দিতে ইচ্ছা করে।

তার মধ্যে *গোদের উপর বিষফোড়া* হয়ে প্রথম নায়কের আগমন না ঘটলে ষোল কলা তো পূর্ণ হতে পারে না। তাই তিনিও এসে হাজির হয়েছেন এবং শুধু হাজির নন, তিনি সশরীরে আমার বারান্দার নিচে। ইউনিভার্সিটির গেটে উপস্থিত থাকেন।

মাঝে মধ্যে যেচে বলি, কষ্ট করে লাভ নেই। আমি অন্য জায়গায় বিয়ে করছি।

একদিন দেখি কথা শুনে চোখ দিয়ে পানি পড়ছে।

মহা ঝামেলা। ছেলেটা আমার সামনে দাড়িয়ে কাদছে, কি অসহ্য!

শেষ পর্যন্ত দেখলাম বিয়ে করা ছাড়া এ ঝামেলার হাত থেকে মুক্তি নেই। সেই জন্য চোখ কান বন্ধ করে *স*-কে শিগগিরই বিয়ে করে ফেলছি। আপনারা বেচারার জন্য দোয়া করবেন। আমি যার বৌ হবো তার অনেক অনেক দোয়ার প্রয়োজন।

গুলশান, ঢাকা থেকে

ঐশ্বরিয়া

– মুজতবা সিরাজী

প্রেম, ভালোবাসা সম্পর্কে আমার ধারণা সব সময়েই নেগেটিভ ছিল। আমার মতে যারা এসব ভালোবাসা বাসি করে বা মেয়েদের পেছনে ঘুর ঘুর করে তারা এক নাম্বারের গর্দভ এবং ব্যক্তিত্বহীন ছেলে। সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হতাম যখন দেখতাম কোনো সেলেব্রিটির জন্য এক-একজন আত্মহত্যা পর্যন্ত করে। আমি ভেবেই পেতাম না এদেরকে কি বলা যেতে পারে? পাগল, উজবুক, নাকি তার থেকেও খারাপ কিছু? কিন্তু উপরওয়ালা প্রমাণ করে দিল আমি তার থেকেও খারাপ। এখন মাঝে মাঝে আমিই চিন্তা করি যে, আমাকে এখন কি উপাধি দেয়া যেতে পারে?

আমি ঐশ্বরিয়া–র ভক্ত (প্রশ্ন–ই আসে না) না হলেও তার সিনেমা দেখতাম। কারণ তার অভিনীত সিনেমার কাহিনী সুন্দর। একদিন দেখলাম *দিল কা রিশতা*। কাহিনী সাধারণ মানের। কিন্তু কেন জানি না সিনেমাটা বেশ ভালো লাগলো আর বার বার দেখতে ইচ্ছা করলো।

কিছু দিনের মধ্যে কেন জানি না কখনো তার কথা মনে হলেই একটা অজানা ভালো লাগায় মনটা ভরে যেতো। কয়েকদিন পরে অবস্থা এমন হলো যে, সব সময়ে খালি ঐশ্বরিয়া–র কথাই মনে হয়। পরে খবরের কাগজে এলো তার একসিডেন্টের খবর। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। খবরের কাগজ থেকে খুব বেশি কিছু জানতে পারলাম না। ইন্টারনেটে www.google.com ওয়েবসাইটে গিয়ে সার্চ দিলাম। প্রচুর খবর পেলাম। জানলাম এখন সে বিপদমুক্ত। সেই সাথে প্রচুর ফ্যানদের ওয়েবসাইটের কথাও জানতে পারলাম যারা নিঃস্বার্থভাবে তাদের হৃদয়ের রানীর কথা, তার গুণাবলীর কথা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

আস্তে আস্তে প্রত্যেক দিন ইন্টারনেটে ঢুকে তার খবর, ছবি এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ভিডিও ক্লিপস সংগ্রহ করা আমার নেশা হয়ে দাড়ালো।

একদিন জানতে পারলাম তার নিজস্ব ওয়েবসাইট চালু হয়েছে (http://aishwaryaworld.com/index.html)। সঙ্গে সঙ্গে গেলাম সেখানে, Message লিখলাম তার উদ্দেশ্যে। মেসেস লেখার সময়ে আবেগে চোখে পানি চলে আসে। ঠিকমত টাইপ করতেও পারছিলাম না হাত কাপার জন্য। ইমেল–এর অ্যাডড্রেসও (ash@aishwaryaworld.com) পেলাম। সেদিন কার্ডের ইউনিট বেশি না থাকায় খানিকক্ষণের মধ্যেই ইন্টারনেটের লাইন গেল কেটে।

এরপর কয়েকদিন বিভিন্ন ঝামেলার কারণে কম্পিউটার চালাতে পারিনি। কিন্তু মন সারাক্ষণ পড়ে থাকলো সেখানে। বুঝতে পারলাম তাকে ভালোবেসে ফেলেছি। আবার এটাও বুঝতে পারলাম, আমি তাদের থেকেও নিম্ন শ্রেণীতে পড়েছি যাদেরকে নিতান্তই নিম্নবুদ্ধির মানুষ বলে মনে করতাম। তাকে পাওয়ার চিন্তা করাটাও হাস্যকর ব্যাপার। কিন্তু মনকে সান্ত্বনা দিলাম এ ভেবে যে, যাকে ভালোবাসি তাকে পেতেই হবে এমন কোনো কথা নেই যদি সত্যিই তাকে ভালোবেসে থাকি। তবে সে সুখে থাকলেই আমি সন্তুষ্ট এটাও 'দিল কা রিশতা'–র একটা ডায়ালগ। আর যেহেতু তাকে ভালোবাসি, তাকে পাওয়ার চিন্তা না করাটাই ভালো। তার খ্যাতি দুনিয়া ব্যাপী। সে সরকারকে ২০০২ সালে ট্যাক্স দিয়েছে আড়াই কোটি রুপির চেয়েও বেশি। আমার তখন আয় বছরে আড়াই টাকাও না।

ওয়েবসাইটের বিভিন্ন ব্যাপারে সাজেশন দিয়ে আর ঐশ্বরিয়া–র উদ্দেশ্যে পোস্ট করা নোংরা মেসেজ-এর ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার ম্যানেজার সিমন শেফিল্ড-কে বিভিন্ন সময়ে মেইল করতাম। মহিলা প্রত্যেক বার–ই অমায়িক ভাষায় ধন্যবাদ জানিয়ে জবাব দিতেন।

এর মধ্যে আমার অবস্থা খুবই খারাপ। সব সময়ে কল্পনায় শুধু তাকেই দেখি। শুয়ে থাকলে মনে হয় সে আমার পাশে এসে বসেছে। চিন্তা করে দেখলাম এই জীবনে তার সাথে হয়তো দেখাও হবে না। তাই ঠিক করলাম আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে যদি পরকালে বেহেশতে যেতে পারি তবে প্রথমে আমি প্রার্থনা করবো আমাকে যেন ঠিক তার মতো একজনকে সঙ্গী হিসেবে দেয়া হয়। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে নামাজ ঠিকমতো পড়া শুরু করলাম। নামাজ পড়তে আলস্য বোধ করলে কল্পনায় দেখতে পেতাম সে আমাকে আমাকে আদর করে ধমক দেয়। এতে আমার সমস্ত অলসতা কেটে যেতো, নতুন করে শক্তি পেতাম।

এভাবে চলতে চলতে একদিন বাস্তবের ঐশ্বরিয়া–র ওয়েবসাইটের Wemaster (নাম–Kryss)-এর কাছে থেকে মেইল পেলাম। সে আমাকে এবং আরেকজন ফ্যান–কে মেসেজ বোর্ড-এর কোমডারেটর হিসেবে সিলেক্ট করলো। জবাবে Kryss লেখে যে, তার পক্ষে প্রত্যেকদিন মেসেজ বোর্ডকে ক্লিন রাখা সম্ভব হচ্ছে না সে প্রথম থেকেই দেখেছে যেকোনো বাজে মেসেজ আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি তাদেরকে ইনফর্ম করি অর্থাৎ আমি রেগুলারলি এ ওয়েবসাইটে ভিজিট করি। এছাড়া আমার প্রত্যেকটা মেসেস পড়ে তার বিশ্বাস হয়েছে, আমি

ঐশ্বরিয়া-র একজন ডেডিকেটেড ফ্যান। আমার ব্যাপারে সিমনও জোরালো সমর্থন করেছে। তাই সে আমাকে এই মেসেজ দিল।

এর কয়েকদিন পরে স্বপ্নের রানীর কাছ থেকে বহু কাঙ্ক্ষিত মেইল পেলাম। আমার তখন জ্ঞান হারানোর মতো অবস্থা হলো যখন আমার hotmail account-এর sender-এর ঘরে দেখলাম Aishwarya Rai-এর নাম আর Subject-এর ঘরে লেখা thanks so much। স্বপ্নের রানী আমাকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়েছে তার মেসেজ বোর্ডকে ক্লিন রাখার জন্য co-moderator হিসেবে কাজ করতে রাজি হয়েছি বলে। শেষে একটা kiss পাঠিয়েছে। আর আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া হলো সে নিজে আমাকে তার ফ্যান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবসে তার প্রতি থাকল অনেক অনেক ভালোবাসা আর শুভেচ্ছা। কোটি মানুষের শুভেচ্ছার মাঝে আমার শুভেচ্ছার হয়তো আলাদা কোনো দাম নেই। কিন্তু এই শুভেচ্ছার জন্ম হৃদয়ের গভীরে। জানি না আমার এই লেখা ছাপানোর উপযুক্ত হবে কি না। তবে এটা যদি প্রকাশিত হয় তবে ভালোবাসা দিবসে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে মেইল করে বলতে পারবো যে, তার প্রতি আমার ভালোবাসার কথা বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় একটি পত্রিকায় ভালোবাসা দিবসের *ভালোবাসা* সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। আবার বলতে পারবো *I love you Aishu. I'll love you forever.* এর ফলে আমি হয়তো তার মনোযোগ সামান্য হলেও আরেকবার আকর্ষণ করতে সক্ষম হবো।

টঙ্গী, গাজীপুর থেকে
seraji3@hotmail.com

ব্যর্থ প্রেমিক

- মাসুদ

১৯৮৩ সালের পহেলা মার্চ আমার জন্ম। আমি পৃথিবীতে আশার পরই আমার আম্মা অসুস্থ হয়ে পড়েন। মেজ খালাম্মা আমাকে অনেক দিন খুব সযত্নে লালন-পালন করেন। অবশ্য কিছু দিন পরে আম্মা সুস্থ হয়। আমার আম্মা একজন স্বল্প শিক্ষিতা মহিলা। তাই আমি ছোট সময় লেখাপড়ায় খুব এগিয়ে যাই। খুব একটা মেধাবী না হলেও ছাত্র হিসেবে খারাপ ছিলাম না। ক্লাসে রোল নাম্বার এক থেকে তিন-এর মধ্যে থাকতো। আমার দাদা সমাজের একজন শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ এসব কিছুর সভাপতি ছিলেন। আমি তার নাতি হওয়ায় স্কুলের স্যারদের কাছে ছিলাম আদরের। তবুও গ্রাম আমার কাছে ভালো লাগতো না।

আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি তখন-ই গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসি এবং শহরের একটা স্কুলে ভর্তি হই। প্রথম অবস্থায় ঠিকমতো লেখাপড়া করলেও পরে লেখাপড়ার চেয়ে বন্ধু-বান্ধব, ছাত্র রাজনীতির প্রতি ঝোক ছিল বেশি।

১৯৯৭ সালে এসএসসি পাস করে যখন কলেজে ভর্তি হলাম তখন নিজেকে খুব বড় ভাবতে শুরু করলাম। সব সময় ক্ষমতা নিয়ে ব্যস্ত, কাউকে তোয়াক্কা করি না। কেউ ভাবতে পারিনি এইচএসসি পাস করতে পারবো, এমনকি আমিও। কিন্তু আল্লাহর রহমতে মাত্র তিন মাস পড়াশোনা করে মোটামুটি ভালো রেজাল্ট করি। পরবর্তীকালে স্থানীয় ইউনিভার্সিটিতে অনার্সে ভর্তি হই। উদ্দেশ্য রাজনীতি করা। পাশাপাশি পাস কোর্সেও ভর্তি হই।

জীবনে অনেক অপরাধ করেছি। কিন্তু কখনো মেয়েদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করিনি। সত্যি বলতে কি, ইচ্ছে করেই মেয়েদের কাছ থেকে সত্তর হাত দূরে থাকতাম। এ জন্য আমার কিছু বন্ধুরা আমার সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করতো। তাদের *মাগিস্ট* নাম দিয়েছিলাম।

সব সময় উল্টা–পাল্টা চলাফেরা করতাম। আমাকে নিয়ে আমার পরিবার খুবই উদ্বিগ্ন। যদি কিছু একটা হয়ে যায়! সবাই আমাকে বোঝাতে লাগলো। কিন্তু *চোরে শোনে না ধর্মের কাহিনী।* আমার মতো করে আমি চলতে লাগলাম।

আমার দাদা আমাকে খুব ভালোবাসতেন। আমিও তাকে খুব সম্মান করতাম। তাই দাদার অনুরোধে আমার জীবনকে বদলে ফেলি এবং কিছু দিন পর পারিবারিক চাপের মুখে একটা চাকরিতে যোগদান করি আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও। প্রথম অবস্থায় খুব খারাপ লাগতো পরে, পেছনের দিকে ফিরে তাকাইনি। কারণ যে পথ ছেড়ে দিয়েছি সেদিকে আর না তাকাই।

অল্প কিছু দিনের মধ্যে অফিসের পাশের প্রত্যেকটি ফ্যামিলির সঙ্গে সু–সম্পর্ক হয়ে যায়।

আমার অফিসের পাশেই বিলকিস নামের (আমার দেয়া ছদ্মনাম) একটা মেয়ে ছিল। তখন সে ক্লাস সেভেনে পড়ে। আমি বলবো না, প্রথম দেখাতেই তাকে ভালোবেসেছি। সে ছিল খুব সুন্দরী। তার সব কিছু আমার কাছে ভালো লাগতো। তাকে সব সময় দেখতে ইচ্ছা করতো। তাই লুকিয়ে লুকিয়ে সব সময় দেখতাম।

আমার বিলকিস এতো দিনে ক্লাস এইটে পড়ে। তার জন্য আমার হৃদয়ে কেমন যেন এক প্রকার ব্যথা অনুভব করি এবং মনে মনে তাকে ভালোবাসি। কিন্তু সাহস নিয়ে তাকে আমার ভালোবাসার কথা জানাতে পারি না। যদি সে আমাকে ফিরিয়ে দেয়! অমতাবস্থায় তার কিছু আচরণে আশ্বস্ত হই যে, আমাকে ফিরিয়ে দেবে না। তবুও তাকে আমার ভালোবাসার কথা জানাইনি।

হঠাৎ একদিন সে আমাকে বলে, কিছু বলবেন।

কিন্তু তাকে কিছু বলার ভাষা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম।

তারপর সে আমাকে বলে, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

তখন আর আমার বুঝতে বাকি রইলো না সে কি বলতে চায়।

কিছু দিন পরে তার অনুরোধে একটা চিঠি দিই এবং আমার ভালোবাসার কথা জানাই।

সে আমাকে ফিরিয়ে দেয়নি।

তখন আমার মনে হয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সুখী আমি এবং আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানালাম।

কিছু দিন পরে অফিসের একটা জরিপ কাজে ঢাকা, বি.বাড়িয়া ও সুনামগঞ্জ সব মিলিয়ে বারো দিন তার কাছ থেকে দূরে থেকেছি। এই বারো দিন আমার কাছে বারো যুগ মনে হয়েছে। সুনামগঞ্জ থেকে আমার কর্মস্থল ভৈরব আসার সময় রাত নয়টার সময় গাড়িতে উঠি এবং রাত সাড়ে তিনটায় কর্মস্থলে আসি।

এসে আর ঘুমাইনি। যদি ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়, ততোক্ষণে হয়তো সে স্কুলে চলে যাবে।

পরের দিন জরিপ ফর্ম নিয়ে ঢাকা যাবো। তাই খুব সকালে তার সঙ্গে দেখা করতে যাই। গিয়ে দেখি সে পেট ব্যথায় অস্থির। মনে করেছি, গ্যাস্ট্রিক–এর ব্যাথা হবে। তাই গুরুত্ব না দিয়ে ঢাকা চলে যাই। কাজ সেরে রাত দশটার সময় চলে আসি। এসে শুনি আমার বিলকিসের অপারেশন হয়েছে। সেই রাত যে আমার কিভাবে কেটেছে তা লিখে বোঝাতে পারবো না।

পরের দিন ওর বাবার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে হাসপাতালে ছুটে যাই। মোট সাত দিন হাসপাতালে ছিল। তার মধ্যে তিন দিন ওর সঙ্গে দেখা করেছি।

সে সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরে আসার কিছু দিন পর তার সদিচ্ছায় আমাদের ডেট হলো। সে আমাকে বুকে টেনে নিল। আমি তাকে সমস্ত ভালোবাসা দিয়ে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিলাম। সেও কোনো কার্পণ্য করেনি। যদিও আমি সীমা লংঘন করিনি।

এর মধ্যে নওগার গাজারু মি. জলিলের ত্রিশে এপ্রিল ডেডলাইনের সঙ্গে আমাদের হেড অফিস থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে প্রজেক্ট ক্লোজ করার নির্দেশ দিল। অফিসের নির্দেশ পেয়ে বাথরুমে গিয়ে কমপক্ষে এক ঘণ্টা কেঁদেছি। আমার প্রিয়তমাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে ভাবতেই আমার খুব কষ্ট হয়েছে।

তাকে আমার চলে আসার কথা জানালাম।

সে একটুও বিচলিত না হয়ে উল্টা আমাকে সান্ত্বনা দিতে শুরু করলো এই বলে যে, সে আমাকে কখনোও ভুলে যাবে না। পড়াশোনা শেষ করে আমার ঘরণী হবে ইত্যাদি।

ওদিকে জলিল পাগলার ডেডলাইন টেকেনি। আমার ডেডলাইনও টেকেনি। প্রজেক্ট-এর মেয়াদ কয়েক মাসের জন্য এক্সটেনশন হলো।

দিনগুলো খুব ভালোই যাচ্ছিল। কিন্তু এরই মধ্যে দেখা গেল বিপত্তি। ওর বাবা মা সন্দেহ না করলেও আশপাশের লোকজন সন্দেহ করে। ওর বাবার কাছে বিচার দিল এবং কিছু দিন পর আমার দেয়া একটি চিঠি ওর বাবার হাতে ধরা পড়লো। তারপর যা হবার তাই হলো। ওর ওপর দিয়ে স্টিম রোলার চালালো। আমার ব্যাপারে স্যারের কাছে বিচার দিল। এক কান, দুই কান করে ক্যাম্পাসের সবাই জেনে গেল।

বিলকিস আমার সঙ্গে যেন যোগাযোগ না করতে পারে তার সব রকমের প্রস্তুতি ওর বাবা নিয়েছে।

এদিকে আমার অবস্থা শোচনীয়। কতো রাত যে সোফায় বসে কেটেছে তার কোনো হিসাব নেই। একত্রে দশটা ঘুমের ওষুধ খেয়েও ঘুমোতে পারি না। ওষুধ আমার শরীরের সমস্ত শক্তি কেড়ে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে রাখে। কিন্তু ঘুম দিতে পারে না।

অনেক কষ্টের পর বন্ধুদের সাহায্যে একটি মেয়ের মাধ্যমে ওর কাছে চিঠি দিই। কিন্তু সে আমার দেয়া চিঠি প্রত্যাখ্যান করে।

সে আমাকে ভুলে গেছে। এ কথা আমার এখনো বিশ্বাস হয় না। এখন আমার চারপাশে শুধু অন্ধকার দেখতে পাই।

আমার বন্ধুরা ওকে ভুলে যেতে বলে। আমাকে আরো আশ্বস্ত করে, ওর চেয়ে ভালো মেয়ে পাবি।

প্রিয় পাঠক, আপনারাই বলুন, প্রথম প্রেমকে কি ভোলা যায়! আমার বিলকিসের চুলের গন্ধ ফুলের সুবাস থেকেও উত্তম। ওর ঠোটের সে এক অন্য রকম স্বাদ, ওর হাতের ছোয়া পৃথিবীর সব ছোয়া থেকে সুন্দর। তাছাড়া আমার হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসার সবটুকই তাকে দিয়েছি। অন্য কারো জন্য তিল পরিমাণ রাখিনি। তাকে ভুলে যাওয়া মানে আমার অস্তিত্বকে ভুলে যাওয়া। কোনোমতেই তাকে ভুলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না।

গত সেপ্টেম্বর মাসে ভৈরব থেকে বদলি হয়ে সীতাকুন্ড আসি। কিন্তু তাকে ক্ষণিকের জন্যও ভুলতে পারি না।

রাতে শুয়ে শুয়ে পুরনো স্মৃতি মনে করে একা কথা বলি। কখনো হাসতে হাসতে পেট ব্যথা হয়ে যায় আবার কখনো চোখের নোনা জলে গাল ভেসে যায়। যখন হুশ ফিরে পাই তখন ভাবি, আমি কি পাগল হয়ে গেলাম! তা না হলে এমন করি কেন! ও আমার সঙ্গে প্রতারণা করলো, আমাকে কষ্ট দিল। তারপরেও আমি ওকে ভালোবাসি এবং আজীবন ভালোবাসবো।

মাদারীপুর থেকে মাসুদ

প্রতীক্ষার প্রহর

আমি নুড়ি। বয়স তখন কতো হবে, ষোল কি সতেরো। অভাবের সংসারে দারিদ্রতার কষাঘাতে আমাদের পরিবার তথা একমাত্র সদ্য বিধবা সৎমা, ছোট্ট দুটি ভাইবোন ও আমি যখন সবাই জর্জরিত ঠিক সেই মুহূর্তে ত্রাণকর্তা রূপে ধরা দিলেন বাবারই এক ফুপাতো বোন সৌভাগ্যক্রমে সচ্ছল পরিবারে যার বসবাস। সংসারে তার রয়েছে মৃত স্বামীর স্মৃতির একমাত্র নিদর্শন আমি।

তখন সে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে অনার্স ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র। ফুপুআম্মা তার সংসারে আমাকে নিয়ে আসেন ও আমাকে তার গ্রামের হাই স্কুলে ক্লাস নাইনে ভর্তি করিয়ে দেন। বাড়িতে পড়াশোনার দায়িত্ব পড়ে দুরন্ত শ্যামলাটে মাঝারি গড়নের বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী অমিয়-র উপর।

ক্লাস নাইনে পড়লেও শারীরিক গড়নে ছিলাম নাকি অতি সুন্দরী। স্কুলে যাবার পথে কামিজ থেকে ওড়না সরে গেলে পথের পাশে দাড়ানো ছেলেরা যে লোলুপ দৃষ্টি দিতো তা আমি লক্ষ্য করতাম। এ যেন মনে হয় তাদের কাছে শুভ্র তুষার আচ্ছাদিত পর্বতের অপরূপ দর্শন। আমিও তখন আমার সারা দেহ ও মনে নানান পরিবর্তনের তীব্র জোয়ার উপভোগ করতাম।

প্রথম মাস দুয়েক একা স্কুলে গেলেও পরে অমিয় এ ব্যাপারটি হয়তো অনুমান করতে সক্ষম হয়েছিল। তখন থেকে সে আমাকে তার কলেজে যাবার পথে বাইসাইকেলে করে স্কুলে নিয়ে যেতো ও ক্লাস শেষে বাড়ি নিয়ে যেতো। সাইকেলে করে তার পেছনে বসতে ভালোই লাগতো।

সে প্রায়ই বলতো, নুড়ি, আমায় শক্ত করে ধর, না হলে পড়ে যাবি।

গ্রামে নিন্দুক শ্রেণীর কিছু লোক নানান কথা বললেও ফুপুআম্মা তা প্রশ্রয় না দেয়ায় নিন্দুকের সে নিন্দা ভোতা হয়ে যায়। কারণ ফুপুআম্মা ছিলেন আমার খুব ভক্ত। তার সকল কাজে সাহায্য–সহযোগিতা করতাম, সময় মতো তার ওষুধপত্র খাওয়াতাম, তার সেবা করতাম। এটা দেখে অমিয় প্রায়ই বলতো, মা, তুমি দেখি এ ডাইনির পাল্লায় পড়ে একেবারে অলস হয়ে পড়ছো। ও চলে গেলে তোমার কি হবে বলো তো?

মা বলতেন, আমি নুড়িকে আমার ঘর থেকে যেতে দিলে তো। কি রে মা, যাবি আমাকে ফেলে?

বুঝতে পারতাম ফুপুআম্মা আমাকে নিয়ে নতুন কোনো স্বপ্নে বিভোর।

অমিয়র তত্ত্বাবধানে আমার পড়াশোনা ভালোই চলছিল। রোজ বিকেলে সে আমাকে নিয়ে পড়াতে বসতো। প্রথম প্রথম লক্ষ্য করতাম যে তার বন্ধুদের সাথে মাঠে খেলতে যেতো আমাকে ঘণ্টা খানেক পড়ানো শেষে। কিন্তু দিন যতো যায়, তার টিচিং ডিউরেশন যতো বৃদ্ধি পায়, খেলায় যাবার স্পৃহা ততো হ্রাস পায়।

একটা সময় সে আর বিকেলে বাইরে যেতো না। পড়ানোর সময় সে আমাকে কোনো একটা পড়া বা অংক খাতায় কষতে দিয়ে শুধু অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো। যখনই খাতা থেকে চোখ যেতো, তার দুই চোখে প্রতি পলকে কেমন যেন একটা নেশার ভাব লক্ষ্য করতাম। সেই দুই চোখের চাহনি মনে হতো চোখ দিয়েই সে আমাকে গিলে খাবে।

আমি যে এতে বিরক্ত হতাম তা নয়। কারণ চোখের ভাষা দিয়ে মনের ভাষা জানার ক্ষমতা আমার ছিল। আমি যে এরই মধ্যে আমার মন তাকে দিয়ে ফেলেছি তা বলার সময়, সাহস ও সুযোগ কোনোটাই আমার হয়নি। ভয় হতো সর্বদা এই ভেবে সে যদি আমাকে ভুল বুঝে ফিরিয়ে দেয়।

এতো কিছুর পরও পড়াশোনা চলছিল পূর্ণ উদ্যমে তার সহায়তায় ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করি স্কুলে।

সামনে রমজানের ঈদ। ঈদের মার্কেট থেকে অমিয় খালাম্মার জন্য একটা শাড়ি ও আমার জন্য আরেকটি জর্জেটের পাতলা নীল রঙের শাড়ি কিনে আনে। শাড়ি পরার জন্য প্রয়োজনীয় ব্লাউজ ইত্যাদি সব ফুপু আম্মাই সেলাই করে দিলেন নিজ হাতে। এসবই হয়েছিল ফুপু আম্মার নির্দেশে।

ঈদে অমিয় আমাকে তার টিফিনের পয়সা বাচানো টাকা দিয়ে কিনে দিয়েছিল লাল ফিতা, রেশমি চুড়ি, কানে ও গলার ইমিটেশনের গহনা।

রমজান মাসে স্কুল বন্ধ। তাই অমিয়কে সে বছর ঈদে কিছুই দিতে পারিনি। এ অতৃপ্ততা এখনো আমাকে বড় পীড়া দেয়।

ঈদের দিন। সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। সবাই নামাজে গেল। আমরা রান্না শেষে সবাই নতুন জামা কাপড় পরছি। ফুপুআম্মা নতুন কাপড় পরে পাশের বাড়ির অমিয়র চাচাতো বোনকে দেখতে গেলেন যার গত রাতে ফুটফুটে প্রথম পুত্র সন্তান হয়েছে।

মনের মতো করে সাজলাম। জানালা দিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি আমার অমিয়র জন্য এই ভেবে যে আজ অমিয়কে সর্বপ্রথমে সালাম করবো। এতো সুন্দর করে আমি এর আগে কখনো সেজেছি বলে মনে পড়ে

না। আয়নার সামনে দাড়িয়ে থমকে গেলাম এই ভেবে যে, আমি এতো সুন্দর নিজেই বেশ লজ্জা পেতে লাগলাম।

এমনি সময় একটি ভারী বলিষ্ঠ হাত এসে পড়লো আমার ব্লাউজের অনাবৃত অংশে। আমি এক অদ্ভুত শিহরণ লক্ষ্য করলাম, এ বুঝি যৌবনে প্রথম স্নিগ্ধ পরশ। পেছন ফিরতেই লক্ষ্য করলাম সে আর কেউ নয়, আমার হৃদয়ের প্রাণ পুরুষ অমিয়।

সে বললো, ঈদ মোবারক, নুড়ি।

যেই না আমি তার পা ধরে সালাম করতে যাচ্ছি, অমনি সে আমার দুই হাত ধরে উপরে টেনে ধরলো। সে বললো, নুড়ি, তুই আজ এতো সুন্দর করে সেজেছিস কার জন্য।

বললাম, কেন, আপনি কিছুই বোঝেন না?

আমি তো মনে হয় বুঝি। তুই তো আমাকে না বোঝার ভান করিস। আজ তোকে আমি একটা কথা বলতে চাই। তুই খুব বুদ্ধিমতী, নিশ্চয়ই সব বুঝতে পারছিস আমি কি বলতে চাই।

এই বলে সে আমার চিবুক দুই হাত দিয়ে টেনে ধরে চোখে চোখ রাখলো।

দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলাম আমি যেন তীব্র শীতের দিনে উত্তপ্ত উনুনের সুখ পেলাম।

এক পর্যায়ে চোখে চোখ রেখে সে বলে ফেললো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাক্যটি। নুড়ি, আমি তোকে আমার হৃদয় দিয়ে ভালোবাসি।

আমি বললাম, আমিও .....।

বলতে না বলতেই সে আমাকে তার বাহুডোরে আবদ্ধ করলো। সঙ্গে সঙ্গে শাড়ির আচল নিচে লুটোপুটি খেতে লাগলো। সে এতো শক্ত করে বক্ষে আমাকে চেপে ধরলো যে আমার গর্বিত বক্ষ চূড়াদ্বয় পিষ্ট হলো। সে আমার ললাট, কপালে ও চিবুকে অবিরাম চুমু খেতে লাগলো। এক পর্যায়ে সে তার তপ্ত অধরে আমাকে ডুবিয়ে দিল।

আমি প্রথমে কেপে উঠলেও পরে অচেনা তৃপ্তিতে ভরে উঠলাম। এক পর্যায়ে সে আমার ব্লাউজ ও ব্রা-র হুক উন্মুক্ত করে আমার উর্ধাঙ্গ নগ্ন করে ফেললো। সে তখন আমার শুভ্র চূড়া, উপত্যকার মাঝে এক অদ্ভুত খেলায় মেতে উঠলো। আমি তখন হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। আমি সম্মোহিতের মতো শুধু মানব মানবীর আদিম সুখের নেশায় মত্ত হলাম।

এক পর্যায়ে সে যখন আমার নিম্নাঙ্গ উন্মুক্ত করতে প্রয়াসী হলো ঠিক তখনই সংবিৎ ফিরে পেলাম এবং তাকে বাধা দিলাম।

সে তা মেনে নিল।

আমি তখন তাকে জড়িয়ে ধরে কাদতে লাগলাম। এ যে সুখের ক্রন্দন। সুখে মানুষ কাদে এ আমার অজানা ছিল।

ঈদ শেষে ফাইনাল পরীক্ষা ভালোই হলো। পরীক্ষা শেষে বাড়ি যাই মায়ের পাঠানো খবরে। যাবার এক সপ্তাহের মধ্যে গ্রামের এক অর্থবান লোকের মাতাল ছেলের সঙ্গে মাত্র পাচ হাজার টাকা ও বসতের বন্ধকি জমি মুক্তির বদলে আমাকে অনেকটা বাধ্য করে বিয়ে দিয়ে দিল।

কিন্তু তাকে নিয়ে এখনো সুখী হতে পারিনি। জানি না আর কখনো পারবো কি না। অমিয়, তোমার স্মৃতি, ভালোবাসা আমাকে তাড়া করে ফেরে সর্বক্ষণ। শুনেছি আমার বিয়ের মাস চারেক পরে কানাডা চলে গেছে অমিয় তার মামার কাছে। হয়তো সে আমাকে ভুল বুঝেছে।

অমিয়র কাছে ক্ষমা চাই। ক্ষমা করো অমিয় তোমার নুড়িকে আর সুখে থাকো। হয়তো এ জীবনে তোমাকে পাবো না। তবে পরজনমের প্রতীক্ষার প্রহর গুণছি।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক